পুষ্টিকর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা

অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভার্সিফাইং ডায়েটস, অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ওমেন ইন বাংলাদেশ

WorldFish

In partnership with

brac

TMSS

CGIAR RESEARCH PROGRAM ON Fish

পুষ্টিকর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা

অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভার্সিফাইং ডায়েটস, অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ওমেন ইন বাংলাদেশ

In partnership with

পুষ্টিকর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা

অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভার্সিফাইং ডায়েটস, অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ওমেন ইন বাংলাদেশ

সম্পাদনা
সায়মা আরজুমান শাহীন, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ
সুমাইয়া তাসকিন, ব্র্যাক বাংলাদেশ
রিফ্‌ফাত আরা, ব্র্যাক বাংলাদেশ

প্রকাশনায়
অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভার্সিফাইং ডায়েটস, অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ওমেন ইন বাংলাদেশ
ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

অর্থায়নে
বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ, ব্র্যান্ডিং
সোহরাব হোসেন, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

ফটোক্রেডিট (প্রচ্ছদ)
ফটো এজেন্সিজ/ওয়ার্ল্ডফিশ

প্রকাশকাল
মে, ২০২০

মুদ্রণে
শিকদার এন্টারপ্রাইজ, ২৯০/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের পুষ্টি কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ও ফলাফল অবলম্বনে এ পুস্তকটি সম্পাদনা করা হয়েছে। এই প্রকাশনায় মুদ্রিত মতামত ও তথ্য প্রকাশের দায় সম্পাদনা পরিষদের একান্তই নিজস্ব। এটি কোনভাবেই দাতাগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন নয়।

সূচিপত্র

অধিবেশন ১ ..... ০৫

অধিবেশন ২ ..... ০৯

অধিবেশন ৩ ..... ১৪

অধিবেশন ৪ ..... ২০

অধিবেশন ৫ ..... ২৬

অধিবেশন ৬ ..... ৬০

অধিবেশন ৭ ..... ৬৪

অধিবেশন ১

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জানতে পারবেন
- খাদ্যের শ্রেণি বিভাগ ও সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানবেন
- অপুষ্টি, অপুষ্টির ফলাফল, শ্রেণি বিভাগ ও অপুষ্টির কারণ সম্পর্কে অবগত হবেন

কার্যক্রম ১: খাদ্য ও পুষ্টির ধারণা

সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীকে খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কি বুঝেন জিজ্ঞাসা করবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা করবেন

১. ১ খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে।

খাদ্য উপাদান ও উৎস

খাদ্যের যেসব রাসায়নিক পদার্থ দেহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে সেগুলোই খাদ্য উপাদান নামে পরিচিত। খাদ্যের উপাদান ৬ প্রকার, এগুলো হচ্ছে-

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করবেন এবং ফুড কার্ডের সেট প্রদান করবেন। তিনটি দলে ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারী খাদ্য, তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য ও রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য এর তালিকা করতে বলবেন।

পুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

পুষ্টিকর খাদ্য

- যেসব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম ও নিরোগ থাকে তা-ই পুষ্টিকর খাদ্য।

  খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। যেকোন খাদ্য গ্রহণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই হতে হবে পুষ্টিকর এবং নিরাপদ।

- পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরণের রোগ হয়। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে।

সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য যাতে খাদ্যের সব পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজন মতো, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ ভেদে সঠিক মাত্রায় থাকে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য হলো এমন একটি খাবার যাতে শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধক উপাদান পরিমাণ মতো রয়েছে।

খাদ্য উপাদান	উৎস
১. শ্বেতসার বা শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, মধু ইত্যাদি
২. আমিষ (প্রোটিন)	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি
৩. তেল ও চর্বি	তেল, মাছ - মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি ইত্যাদি
৪. ভিটামিন	দুধ, ডিম, কলিজা, সব ধরণের শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি
৫. খনিজ উপাদান	মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক- সব্জি, লবণ ইত্যাদি
৬. পানি	আর্সেনিক ও জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি

কার্যক্রম ২: সময় ২৫ মিনিট

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ

১. **ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারী খাদ্য: (আমিষ জাতীয়)** যেমন: মাছ, মাংস, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, দুধ, ডিম, শিমের বীচি, ছোট মাছ, বড় মাছ, কলিজা ইত্যাদি

২. **তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য: (শর্করা ও চর্বি জাতীয়)** যেমন: ভাত, রুটি, আলু, গুড়, চিনি, মিষ্টি আলু, পাউরুটি, তেল, মাখন, ঘি, চর্বি, মধু, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, নারকেল ইত্যাদি

৩. **রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য: (ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ)** যেমন: গাঢ় হলুদ ও সবুজ রঙের সব ধরণের শাক-সব্জি ও ফলমূল, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোট মাছ, দুধ, ডিম, কলিজা ইত্যাদি

কার্যক্রম ২: অপুষ্টি, অপুষ্টির কারণ ও ফলাফল

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে দুইটি দলে ভাগ করে দেবেন। ১ম দলকে অপুষ্টির কারণ সমূহের তালিকা তৈরী করতে বলবেন এবং ২য় দলকে অপুষ্টির ফলাফল বা পরিনতির তালিকা করতে বলবেন এবং উপস্থাপন করতে বলবেন। এজন্য তারা ১০ মিনিট সময় পাবে, তাদের সঠিক ধারণার প্রশংসা করবেন এবং যেগুলো সঠিক নং সেগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবেন।

সময়ঃ ২০ মিনিট

১. ২ অপুষ্টি

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কিংবা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে যে অবস্থার (কৃশকায় বা স্থুলতা) সৃষ্টি হয় তাকে অপুষ্টি বলে। উন্নয়নশীল দেশে অপুষ্টি বলতে পুষ্টিহীনতা অর্থ্যাৎ খাদ্যের অভাবকে বোঝায়।

অপুষ্টির প্রধান কারণসমূহঃ

- দারিদ্র্য
- খাদ্যের অপর্যাপ্ততা
- কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ
- ঘন ঘন অসুস্থতা, বিশেষ করে সংক্রামক রোগে ভোগা
- মা ও শিশুর যথার্থ পরিচর্যার অভাব

অপুষ্টির ফলাফল

- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে দেহ দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়
- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা কমে যায়। অপুষ্টি দীর্ঘ মেয়াদী হলে মারাত্মক অসুস্থতা বা মৃত্যু হতে পারে
- অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা: মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি-এর কারণে মৃত্যু হার অনেক বেশি (প্রায় ৯ গুণ), এ কারণে এ বিষয়টির দিকে সকলেরই বাড়তি নজর দিতে হবে যাতে মারাত্মক তীব্র অপুষ্ট শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়
- মাঝারী ও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে চিহ্নিত করে প্রাণঘাতী অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

শিশুকে সঠিকভাবে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান না করলে তার শারীরিক বৃদ্ধি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সে খর্বাকৃতি (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা কম) ও অপুষ্ট কিশোর/কিশোরী হিসেবে বেড়ে উঠে। আর একজন অপুষ্ট কিশোরী যখন গর্ভধারণ করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই কম ওজনের শিশুর জন্ম দেয় আর ঝুঁকি বেড়ে যায়। সেই কম ওজনের শিশুটি যদি মেয়ে হয় এবং তাকেও সঠিকভাবে খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা না দেয়া হয়, তাহলে সেও অপুষ্টিতে ভুগবে এবং বড় হয়ে বিয়ের পর অপুষ্ট শিশু জন্ম দেবে। এভাবে অপুষ্টির চক্র বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে, যার পরিণতি ভয়াবহ। এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, অপুষ্টি একটি বড় ধরণের স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক সমস্যা, যা প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য।

কার্যক্রম ৩: অপুষ্টির প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা

সহায়ক স্লাইডে নিম্নোক্ত ছক/ফ্লোচার্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম অপুষ্টি নিয়ে আলোচনা করবেন।

সময়ঃ ২০ মিনিট

১. ৩ অপুষ্টির ধরণ ও প্রকারভেদ

শরীরে ক্রমাগত কম পুষ্টি গ্রহণ কিংবা শরীরে শোষণজনিত কোন সমস্যা থেকে অপুষ্টি তৈরি হয়। অপুষ্টিকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়ঃ

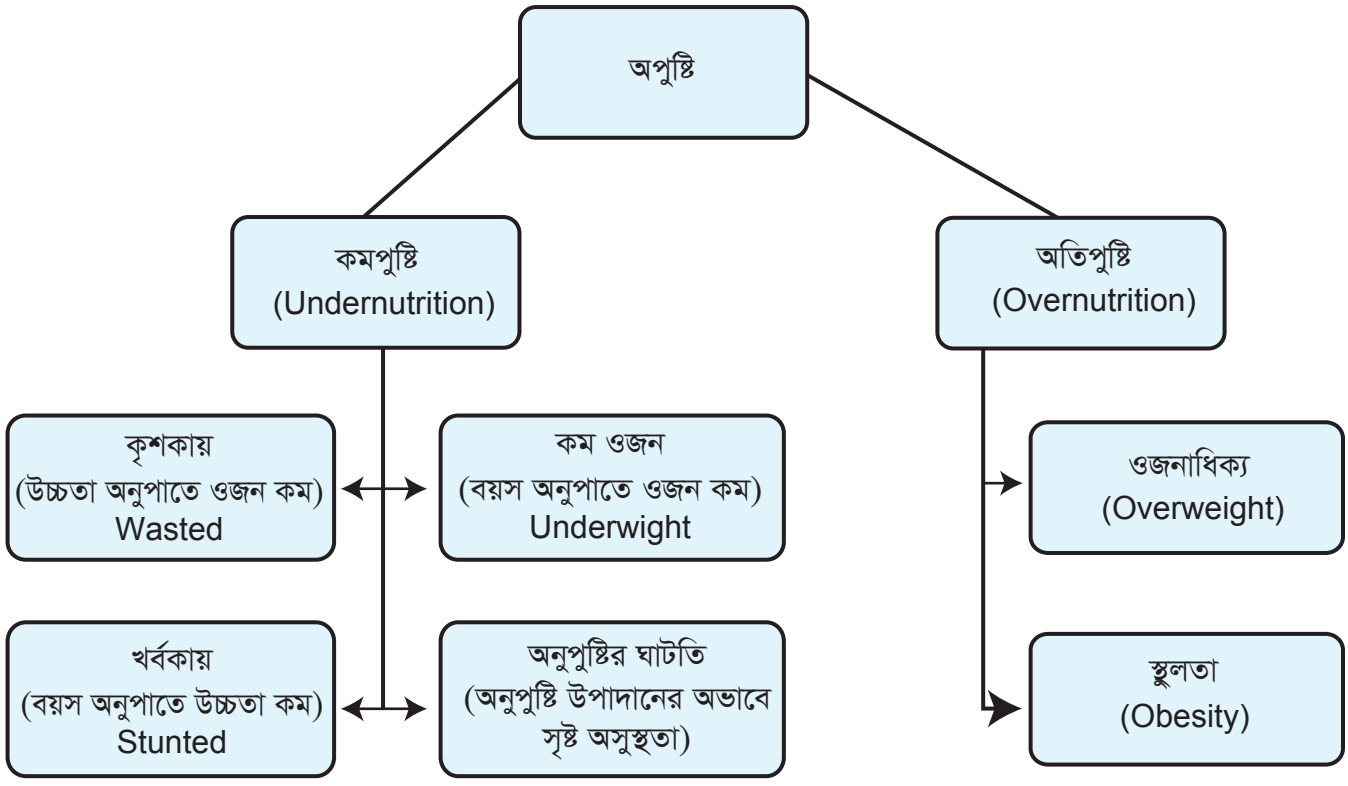
অপুষ্টি
কমপুষ্টি
(Undernutrition)
অতিপুষ্টি
(Overnutrition)
কৃশকায়
(উচ্চতা অনুপাতে ওজন কম)
Wasted
কম ওজন
(বয়স অনুপাতে ওজন কম)
Underwight
ওজনাধিক্য
(Overweight)
খর্বকায়
(বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম)
Stunted
অনুপুষ্টির ঘাটতি
(অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবে
সৃষ্ট অসুস্থতা)
স্থুলতা
(Obesity)

অধিবেশন ২

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ খাদ্য বৈচিত্র্য কি, এর প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যকে বৈচিত্র্যময় করার কৌশল জানতে পারবেন। মা ও শিশুর খাদ্য বৈচিত্র্যের ন্যুনতম মাপকাঠি সম্পর্কে অবগত হবেন। এছাড়াও মাছের পুষ্টি, মাছ খাওয়ার গুরুত্ব, মলা মাছের পুষ্টি গুণাগুণ, বিভিন্নরকম মাছের রেসিপি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কার্যক্রম ১ খাদ্য বৈচিত্র্য

সহায়ক খাদ্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা জানতে চাইবেন। সকলের মতামতের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক স্লাইডের মাধ্যমে খাদ্য বৈচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সময়ঃ ২০ মিনিট

খাদ্য বৈচিত্র্য কী এবং কেন প্রয়োজন?

- খাবারে বৈচিত্র্যতা উচ্চমানের খাদ্যের মূল উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন খাবার এবং খাদ্য গ্রুপগুলো বিভিন্ন পুষ্টির উৎস, তাই বিভিন্ন ধরণের খাবারের সমন্বয় পুষ্টির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করে।
- খাবার এমন হতে হবে যেন, সেই খাবার পরিমাণে সঠিক হয় এবং সব রকম পুষ্টি থাকে;
- বৈচিত্র্যময় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি, আমিষ এবং অনুপুষ্টির (micro nutrient) চাহিদা পূরণ করে;
- মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের খাবার খেতে হবে, এতে খাওয়ার রুচি বাড়ে।

মনে রাখবেন-

১. প্রতিদিন মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা অথবা ডাল, বাদাম, বীচি জাতীয় খাবার খেতে হবে, যা দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে;

২. গাঢ় সবুজ শাক সবজি, লাল ও হলুদ রঙের ফল এবং বিভিন্ন ধরণের শাক সবজি ও ফল (যেমন- কচুশাক, পুঁই শাক, লাল শাক, ডাটা শাক, মিষ্টি কুমড়া, গাজর এবং পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি) এগুলোর যে কোন এক প্রকার প্রতিদিন অবশ্যই খেতে হবে, কারণ এসব খাবার থেকে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন পাওয়া যায়, যা শরীরকে অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করে।

৩. ১ কাপ দুধ অথবা দুধের তৈরি খাবার প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে ৩-৪ দিন খেতে হবে,

৪. অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে সব রকম রান্না করতে হবে।

খাদ্যকে বৈচিত্র্যময় করতে হলে, পরিবারে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, পরিবারে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার উপায়সমূহ হলো-

- মিশ্র ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন
- নতুন ধরণের ফসল চাষ, যেমন সূর্যমুখী, ভূট্টা, সয়াবিন ইত্যাদির চাষ
- ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁস-মুরগী পালন
- বসতবাড়িতে মাছ চাষ
- কম ব্যবহৃত দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বসত বাড়িতে শাক সবজির বাগান করা
- মৌসুমী খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও আহরণজনিত ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার জন্য উন্নতমানের প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- অংকুরোদগম ও ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া (যেমন দই) অন্তর্ভুক্তকরণ

সময়ঃ ২০ মিনিট

খাদ্য বৈচিত্র্যের ন্যুনতম মাপকাঠিঃ

বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক খাবার থেকে শিশুর জন্য বৈচিত্র্যময় বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে। নিচে দেয়া বিভিন্ন খাবারের তালিকা থেকে কমপক্ষে ৪টি ভিন্ন ধরণের খাবার নিয়ে শিশুর জন্য প্রতিদিনের খাবার তৈরি করতে হবে এবং এর ভিতর দিনে অন্ততপক্ষে ১টি প্রাণীজ খাবার থাকতে হবে-

১. শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন- ভাত, রুটি, চিড়া, আলু, সুজি
২. বিভিন্ন ধরণের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম
৩. দুধ এবং দুধ দিয়ে তৈরি খাবার
৪. প্রাণীজ খাবার যেমন- মাছ, মাংস
৫. মুরগীর কলিজা
৬. ডিম
৭. গাঢ় ঘন সবুজ ও লাল শাক; এছাড়াও হলুদ ও কমলা রঙের সবজি ও ফল, যেমন- মিষ্টিকুমড়া, গাজর, পাকা আম, পাকা পেঁপে
৮. অন্যান্য শাক সব্জি ও ফল যেমন: লাউ, ঝিংগা, ফুলকপি, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি

১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী সকল মহিলার খাদ্য তালিকায় নিম্নোক্ত খাদ্য তালিকার কমপক্ষে ৫টি ভিন্ন ধরণের খাবার থাকা আবশ্যকঃ

১. শস্য, মূল ও কন্দ জাতীয় খাদ্য
২. ডাল (শীমের বিচি, মটর শুঁটি এবং ডাল)
৩. বাদাম এবং বীজ জাতীয় খাবার
৪. দুধ ও দুগ্ধ জাত খাবার
৫. মাছ, মাংস
৬. ডিম
৭. গাঢ় সবুজ শাক
৮. অন্যান্য ভিটামিন এ সমৃদ্ধ রঙিন ফল ও শাক সবজি
৯. অন্যান্য শাক সবজি
১০. অন্যান্য ফল

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মাছের পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা জানতে চাইবেন। সকলের মতামতের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সহায়ক স্লাইডের মাধ্যমে মাছের পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং মাছ খাওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করবেন।

কার্যক্রম ৩. ২ মাছ ও মাছের পুষ্টি

সময়ঃ ২০ মিনিট

মাছের গুণাগুণ

- বাঙালির অতি প্রিয় খাদ্য
- উচ্চ আমিষযুক্ত খাবার
- প্রাণীজ আমিষের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ যোগান দেয় মাছ
- মাছের প্রোটিন সহজপাচ্য এবং দেহ গঠণে সহায়ক

মাছ খাওয়ার গুরুত্ব

- মাছ উন্নতমানের প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকারী
- মাছে বিদ্যমান অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ দেহের গঠন, বর্ধন ও রোগ প্রতিরোধে বিশেষভাবে সহায়ক
- ছোট মাছ, বিশেষ করে মলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও জিংক থাকে, যা মানব দেহের গঠন বর্ধন ও রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- দেশী ছোট মাছ গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিশেষতঃ শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়
- কাঁটাসহ দেশী ছোটমাছ খেলে শরীরে ক্যালসিয়াম এর চাহিদা পূরণ হয়, যা দাঁত ও হাড় গঠনে এবং মজবুত করণে বিশেষ ভুমিকা পালন করে
- ছোট মাছ বিশেষ করে মলা মাছে প্রচুর আয়রন আছে, আয়রন দেহের রক্ত বর্ধক
- মাছের দেহের ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড রক্তের জমাট বাঁধা রোধ এবং ফুসফুসের প্রদাহ হ্রাস করে
- মাছের তেল ক্ষতিকর কোলেস্টেরল হ্রাস এবং কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে

মাছের পুষ্টিমান

মাছের নাম	প্রোটিন [গ্রাম/১০০ গ্রাম মাছ]	আয়রন [মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম মাছ]	ক্যালসিয়াম [মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম মাছ]	জিঙ্ক [মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম মাছ]	ভিটামিন-এ [মাইক্রো গ্রাম]
মলা	১৭.১	৩.৮	৭৬৭	৩.১৯	২৬৮০
কাতলা	১৯.৯	০.৬	৫৩০	০.৪৮	৩
সিলভার কার্প	১৭.৫	১.৫	২২	০.২৮	-
রুই	২০.৬	০.৪	৩০	১.১৩	৪
মৃগেল	১৮.৬	১.৮	৬৫৫	০.২৯	১১
কমন কার্প	১৮.৭	০.৯	৪৭	০.৭৩	২
তেলাপিয়া	২০.৮	০.৫	১৯	১.৪০	২
থাই সরপুঁটি	১৭.৮	০.৬	২৪	০.৭৪	-
কৈ	১৭.৫	১.২	৬৪	১.১৩	২১৫
মাগুর	১৫.৬	০.৮	২৭	০.৫৩	১৫
শিং	১৭.২	২.১	৩১৯	০.৫৫	১৬

কার্যক্রম ৩. ২ মলা ও অনুপুষ্টি

সহায়ক পূর্ববর্তী অধিবেশনে আলোচ্য অনুপুষ্টি উপাদান এর বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং এর উৎস হিসেবে মলা মাছের উদাহরণ দিবেন। ছবিসহ স্লাইড দিয়ে মাছের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সম্ভাব্য রেসিপি জানতে চাইবেন। এরপর স্লাইড থেকে রেসিপি বর্ণনা করবেন।

সময়ঃ ৪০ মিনিট

- মলা মাছের যকৃতের চর্বি জাতীয় পর্দাথ ভিটামিন এ ও ডি তে সমৃদ্ধ-যা আমাদের হাড়, দাঁত, চর্ম ও চোখের জন্য প্রয়োজনীয়
- মলা মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও আয়োডিনের মতো খনিজ পদার্থ
- মলা মাছ রাতকানা, রক্তশূন্যতাসহ অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- মলা মাছে বিদ্যমান ভিটামিন-এ রাতকানাসহ বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধ সহায়ক

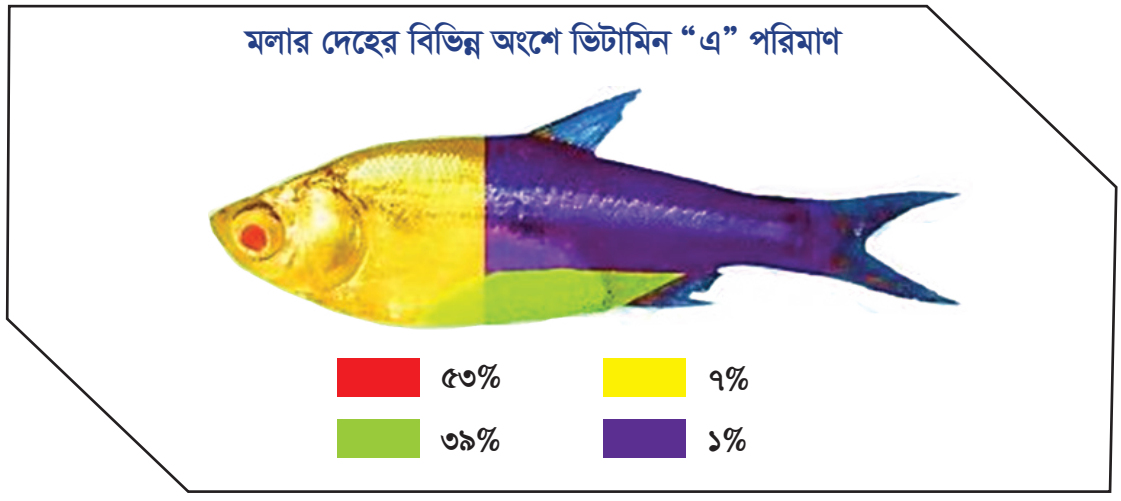

চিত্র: মলা মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে ভিটামিন-এ এর পরিমাণ

ছোট মাছ ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা

ছোট মাছের অনুপুষ্টিকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করার জন্য এর অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। সাধারণত মাছ খাওয়ার জন্য প্রস্তুতির সময় (কাটাবাছা, ধোয়া, রান্না) পুষ্টির অপচয় হয়ে থাকে। মাছের মাথা ও পেটের অংশ কেটে ফেলে দেয়া, বারবার ধোয়া, দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করার ফলে এ অপচয় বেশী হয়ে থাকে।

প্রায় ক্ষেত্রে ছোট শিশুরা অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ ছোট মাছ গলায় কাঁটা লাগার ভয়ে খেতে চায় না। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ছোট মাছকে শিশুর খাওয়ার উপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। আধাসিদ্ধ ছোট মাছকে বেটে খিচুঁড়ীর সাথে মিশিয়ে রান্না করে সহজেই খাওয়ানো যায়।

মলা মাছের পুষ্টিগুন সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন রেসিপি

মলা মাছ আমিষ সমৃদ্ধ এবং সহজপ্রাচ্য। মলা মাছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে। এসব পুষ্টি উপাদান পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করার জন্য এর অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এ সকল মাছ খাওয়ার জন্য তৈরীর (কাটাবাছা, ধোয়া, রান্না) সময় পুষ্টির অপচয় হয়ে থাকে।

কাটাবাছা ও রান্নার জন্য প্রস্তুতকরণ

মলা মাছ কাটা-বাছার পদ্ধতি অন্যান্য ছোট মাছের মতোই। মাছের আকার খুবই ছোট হলে কাটাকাটি না করে পরিষ্কার পানিতে ১-২ বার ধুয়ে রান্না করা যেতে পারে। তবে মাঝারি ও বড় আকারের মলা, ঢেলা ও দারকিনার জন্য মাছ কাটা-বাছার সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে আঁইশ, পাখনাসমুহ ও পাকস্থলি ফেলে দিতে হবে। তবে মাছের আকার ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, মাছের মাথা কেটে ফেলে দেয়া যাবে না। কারণ মলা, ঢেলা, দারকিনাসহ অন্যান্য সব ছোট মাছের বেশির ভাগ ভিটামিন ও মিনারেল মাথায় থাকে। মাছ বাছা হয়ে গেলে টিউবওয়েলের পরিষ্কার পানিতে ১-২ বার ধুয়ে নিতে হবে। এর বেশি বার ধোয়ার দরকার নেই। ছোট মাছ ধোয়ার সময় লবণ ব্যবহার করা উচিত নয়। লবণ ব্যবহার করলে ছোট মাছে উপস্থিত ভিটামিন ও মিনারেলের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

মলা মাছের রেসিপি

- আমাদের দেশে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের মসলা (লবণ, উদ্ভিজ্জ তেল, হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ, ধনিয়া ও জিরার গুঁড়া) মিশিয়ে মলা, ঢেলা ও দারকিনা জাতের মাছগুলো রান্না করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাছগুলো বিভিন্ন প্রকারের সবজি - যেমন বেগুন, আলু, টমেটো, লাউ, কুমড়া, সিম, বরবটি, ঝিংগা, ধুন্দুল প্রভৃতির সাথে রান্না করা হয়। মাছগুলোর সাথে বিভিন্ন ধরণের শাক যেমন লালশাক, পুঁই শাক প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মেশানো যেতে পারে
- কোন শাক সবজি ছাড়াই শুধুমাত্র ছোট মাছ দিয়েও তরকারি রান্না করা যেতে পারে - যেমন মাছের ঝোল ও দোপেঁয়াজি

- মলা মাছকে অল্প তাপে অল্প সময়ের জন্য তেলে ভেজে বা পানিতে সিদ্ধ করে লবণ, তেল, কাঁচা মরিচ ও পিঁয়াজ সহকারে খুব সহজেই সুস্বাদু ভর্তা বানানো সম্ভব
- এই ছোট মাছগুলো দিয়ে ছোট বাচ্চাদের জন্য উপযোগী করে খিচুরিও রান্না করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মলা মাছকে কাটা-বাছা ও ধোয়ার পর অল্প সময়ের জন্য তেলে ভেজে শিল-নোড়ায় বা ব্লেন্ডার মেশিনে গুঁড়া করে পেষ্টের মতো করে খিচুরির অন্যান্য উপকরণের (চাল, ডাল, সব্জি, মশলা প্রভৃতি) সাথে মিশিয়ে সাধারণ নিয়মে খিচুরি বানানো যেতে পারে
- ছোট মাছ কখনোই দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করা উচিত নয়। বেশির ভাগ রান্নাই সর্বোচ্চ ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করা সম্ভব। অন্যান্য উপকরণ সিদ্ধ/রান্না হতে বেশি সময় লাগলে ছোট মাছগুলোকে রান্না শেষ হওয়ার ১০-১৫ মিনিট আগে যোগ করা উচিত।

অধিবেশন ৩

কার্যক্রম ১: অনুপুষ্টি উপাদান, উৎস, গুরুত্ব, অভাবজনিত সমস্যা

সময়ঃ ৩০ মিনিট

২. ১ অনুপুষ্টি

মুখ্য পুষ্টি উপাদানসমূহ যেমন-শক্তিদায়ক খাদ্য (শর্করা), বৃদ্ধিকারক খাদ্য (আমিষ) এবং অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ যেমন- ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান সমূহ এসব নিয়েই হয় স্বাস্থ্যকর খাবার। এখানে ম্যাক্রো (মুখ্য) বলতে 'বড়' এবং মাইক্রো বলতে 'ছোট' বুঝানো হয়। ভালভাবে কাজ করার জন্য আমাদের শরীরে যে সকল অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ প্রয়োজন, এই অধিবেশনে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। অনুপুষ্টি উপাদান সমূহ আমাদের অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করা না হলে একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। সাধারণত প্রতিদিন ১০০ মিলিগ্রাম এর বেশি বা কম হলে মুখ্য বা অনু বলা হয়।

অনুপুষ্টি উপাদান এর গুরুত্বঃ

- শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য
- শরীরের বিভিন্ন কোষ ও অঙ্গকে সঠিকভাবে কাজ করতে এবং বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় করতে সহায়তা করে
- রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
- খাবারে রুচি বাড়ায়

অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ-

অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ খাদ্যে অনেক ধরণের অনুপুষ্টি আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-

ভিটামিন এ	আয়রন
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স	আয়োডিন
ভিটামিন সি	জিংক
ভিটামিন ডি	ক্যালসিয়াম

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ এর উৎস ও অভাব জনিত সমস্যা নিচে দেয়া হলোঃ

পুষ্টি উপাদান	উৎস	অভাবজনিত সমস্যা
ভিটামিন এ	**প্রাণীজ উৎসঃ** মায়ের দুধ, কলিজা, ডিমের কুসুম, ছোট মাছ, মাছের তেল, মাখন, ঘি। প্রাণীজ উৎস থেকে ভিটামিন এ গ্রহণ করলে তা আমাদের শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। **উদ্ভিজ্জ উৎসঃ** হলুদ রঙের ফল- পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, পাকা পেঁপে এবং সব ধরণের গাঢ় শাক-সব্জি যেমন- গাজর, মিষ্টি কুমড়া, কচু শাক, মূলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ধনে পাতা, পুঁই শাক, কলমি শাক, সজনে শাক, লাল শাক, পাট শাক, পালং শাক, থানকুনি পাতা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি।	• চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে রাতকানা, চোখে ঘা ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি চোখ অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হয়, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। • দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়

পুষ্টি উপাদান	উৎস	অভাবজনিত সমস্যা
ভিটামিন বি (কমপ্লেক্স)	দুধ, ডিম, মিষ্টি আলু, বাদাম, বাঁধাকপি, পালংশাক, কলা, শুটকি, ঢেঁকিছাটা চাল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ডাল, মৌসুমী ফল, বিভিন্ন শাক-সবজি, মলা ঢেলাসহ বিভিন্ন মাছ ও মাংস ইত্যাদি।	• জিহ্বায় ও ঠোঁটের কোনায় ঘা হয়। • রক্তস্বল্পতা হয় ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। • কর্ম ক্ষমতা কমে যায় এবং অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। • স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। • বিভিন্ন স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয় ও হাত পা ঝিম ঝিম করে। • মুখে (ব্রন) দানা ওঠে, ত্বক খসখসে হয়।
ভিটামিন সি	লেবু, কমলা, আঙ্গুর, আপেল, পেঁপে, বড়ই, আনারস, ইত্যাদি টক ফল ও ফলের রস, টমেটো, শাক-সবজি, বাঁধাকপি, পালং শাক, আলু ইত্যাদি।	• সর্দি-কাশি সহ ঘন ঘন অসুস্থ হয়। • রক্তস্বল্পতা • হাড় ও মাড়ি দুর্বল হয়। হাড়ে ও গিরায় ব্যথা হয়। • হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
ভিটামিন ডি	দুধ, মাখন, চর্বিযুক্ত মাছ, পনির, শস্য, মাশরুম, শুটকি, সূর্যের আলো ইত্যাদি।	• হাড় ও দাঁত গঠনে দুর্বলতা। • দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
ভিটামিন ই	লাল মরিচ, শালগম, পেঁপে, টমেটো, আম, চিনা বাদাম, কাঠ বাদাম, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম, সরিষা শাক ইত্যাদি।	• স্নায়ুতন্ত্রের তথ্য প্রেরণে বাধা। • পেশির সঠিক ঘনত্ব বজায় থাকে না। • চোখের রেটিনার পূনর্গঠনে ভূমিকা রাখে।
আয়রন	**প্রাণীজ উৎস:** মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুটকি মাছ ইত্যাদি। **উদ্ভিজ্জ উৎস:** কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টিকুমড়া শাক, সাজনা শাক, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল, খেজুর, কালোজাম, তরমুজ, পাকা তেঁতুল, গুড় ইত্যাদি।	• চোখের আবরন (কন্‌জাংটিভা), নখের গোড়া এবং নখে পরিবর্তন আসে, হাতের তালু, চেহারা, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। • নখ ভংগুর হয়, আপনা আপনি ভেঙ্গে যায় এমনকি মধ্যাংশে কমে/দেবে যায় (koilonychia) • বুক ধড়ফড় করে • অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি বোধ হয় • মেজাজ খিটখিটে থাকে • ক্ষুধামন্দা হয় • শিশুরা অস্থির চিত্তের হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ কমে আসে
আয়োডিন	**প্রাকৃতিক:** সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলবর্তী শাক-সব্‌জি এবং শ্যাওলা **কৃত্রিম:** আয়োডিনযুক্ত লবণ	• গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হয় • স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশে বাধা দেয় • মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধিতা যেমন: হাবাগোবা, মূক, ট্যারা, বধির, খর্বকায় ইত্যাদি • গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসব অথবা জন্মের পর পর শিশুর মৃত্যুও হতে পারে

পুষ্টি উপাদান	উৎস	অভাবজনিত সমস্যা
জিংক	**প্রাণীজ:** মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম **উদ্ভিজ:** খোসাসহ শস্য, ডাল, বাদাম এবং ঢেঁকি ছাটা চাল	• শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় • শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় • যৌনাঙ্গের গঠন ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হয় না • হাড়ের পরিপক্কতা ব্যাহত হয়
ক্যালসিয়াম	**প্রধান উৎস - দুধ** মায়ের দুধের চেয়ে গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশী থাকলেও মায়ের দুধ শিশুর জন্য ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে উত্তম উৎস, কারণ এটি শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম অনেক খাবারেই পাওয়া যায়, যেমন- দুধ জাতীয় পণ্য (পনির, মাখন, দই), ডিম এবং মাছ।	• হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না • রক্ত জমাট বাধতে বাধাপ্রাপ্ত হয় • মাংসপেশীর সংকোচন বাধাপ্রাপ্ত হয় • হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয় • মায়ের দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয় • বয়স্ক মহিলাদের হাঁড়ের ক্ষয় রোধ (অস্টিওম্যালেসিয়া) দেখা দেয়

মনে রাখতে হবে

- মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা অথবা ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি জাতীয় খাবার প্রতিদিন খেতে হবে, যা দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে
- গাঢ় সবুজ শাক-সব্জি, লাল ও হলুদ রঙের ফল এবং বিভিন্ন ধরণের শাক-সব্জি ও ফল (যেমন- কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, ডাটা শাক, মিষ্টিকুমড়া, গাজর এবং পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি) এগুলোর যে কোন এক প্রকার প্রতিদিন অবশ্যই খেতে হবে কারণ এইসব খাবার থেকে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন পাওয়া যায়, যা শরীরকে অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করে
- ১ কাপ দুধ অথবা দুধের তৈরি খাবার প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে ৩-৪ দিন খেতে হবে
- অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে সবরকম রান্না করতে হবে

কার্যক্রম ২: আয়রন এর গুরুত্ব, অভারজনিত সমস্যা চিহ্ন ও উপসর্গ রক্তস্বল্পতা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার

সময়ঃ ৩০ মিনিট

২. ২ আয়রন

আয়রন একটি খনিজ উপাদান, যা রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিমোগ্লোবিন তৈরীর জন্য অপরিহার্য। এই হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে শরীরের সকল অংশে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন বহন করে, যার কারণে শরীর কর্মক্ষম থাকে।

আয়রন এর উৎস

প্রাণিজ উৎস: মাংস, মাছ, কলিজা, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ উৎস: মিষ্টি আলুর শাক, কাঁচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টিকুমড়া শাক, সজনে পাতা, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল, খেজুর, কালোজাম, তরমুজ, পাকা তেঁতুল, গুড় ইত্যাদি।

ছবি:আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য

আয়রন এর অভাবজনিত সমস্যা চিহ্ন ও উপসর্গ

- চোখের আবরন (কনজাংটিভা), নখের গোড়া এবং নখে পরিবর্তন আসে, হাতের তালু, চেহারা, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়
- নখ ভংগুর হয়, আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়, এমনকি মধ্যাংশে কমে/দেবে যায় (koilonychia)
- বুক ধড়ফড় করে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি বোধ হয়
- মেজাজ খিটখিটে থাকে
- ক্ষুধামন্দা হয়
- শিশুরা অস্থির চিত্ত হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ কমে আসে

রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া

অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতা বলতে আমরা প্রধানত আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্ত স্বল্পতাকেই বুঝি। এই ধরণের রক্তস্বল্পতাই আমাদের মাঝে ব্যাপক আকারে বিদ্যমান। রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়াকে রক্তস্বল্পতা বলে। প্রয়োজনীয় খাবার, বিশেষ করে আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরা এই রোগে বেশি ভোগে। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় প্রধানত আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের অভাবে। মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে এবং ঘন ঘন সন্তান হওয়ার কারণেও মহিলারা রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার

- আয়রনসমৃদ্ধ খাবার যেমন- মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুঁটকি মাছ, কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া শাক, সজনে পাতা, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি পাতা, ছোলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ডাল ইত্যাদি খেতে হবে
- শরীরে আয়রন কাজে লাগানোর জন্য আয়রন জাতীয় খাবারের সাথে ভিটামিন সি যুক্ত (যেমন- লেবু বা টক ফল) খাবার খেতে হবে
- শিশুকে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি আয়রনসমৃদ্ধ বাড়তি খাবার দিলে শিশুর আয়রনের ঘাটতি পূরণ হবে
- বাড়ন্ত শিশু, কিশোর-কিশোরী, মাসিক চলাকালীন, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে আয়রনের প্রয়োজন। তাই তাদেরকে বেশি করে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে

- সংক্রামক রোগ যেমন- কৃমি, রক্ত আমাশয়, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির কারণেও রক্তস্বল্পতা হয়, এজন্য মল-মূত্র নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা এবং মল-মূত্র ত্যাগের পরে দুই হাত ভালো করে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। খাওয়ার আগে দুই হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা এবং খালি পায়ে না হাঁটা
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে
- দুপুর এবং রাতের প্রধান খাবারের সাথে চা ও কফি না খাওয়া

কার্যক্রম ৩: ভিটামিন এ এর গুরুত্ব, অভাবজনিত সমস্যা চিহ্ন ও উপসর্গ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার

সময়ঃ ২০ মিনিট

২. ৩ ভিটামিন-এ

শিশুদের মাঝে অন্ধত্বের প্রধান কারণ হলো ভিটামিন-এ এর অভাব। ভিটামিন-এ তেলে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন-এ উৎস

প্রাণীজ উৎস: মায়ের দুধ, কলিজা, ডিমের কুসুম, ছোট মাছ, মাছের তেল, মাখন, ঘি। প্রাণীজ উৎস থেকে ভিটামিন এ গ্রহণ করলে তা আমাদের শরীরে দ্রুত শোষিত হয়।

উদ্ভিজ্জ উৎস: হলুদ রঙের ফল- পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, পাকা পেঁপে এবং সব ধরণের গাঢ় শাক-সব্জি যেমন- গাজর, মিষ্টি কুমড়া, কচু শাক, মূলা শাক, হেলেঞ্চা শাক, ধনে পাতা, পুঁই শাক, কলমি শাক, সজনে শাক, লাল শাক, পাট শাক, পালং শাক, থানকুনি পাতা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি।

ছবি: ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য

ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যা:

- চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে রাতকানা, চোখে ঘাঁ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয় এমনকি চোখ অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হয়, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।
- দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যার প্রতিরোধ

- গর্ভাবস্থায় মায়েদের ভিটামিন-এ এর চাহিদা বেড়ে যায়, এজন্য ভিটামিন-এ এর অভাব পূরণের জন্য গর্ভবতী মায়েদের ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার যেমন-গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, হলুদ ফলমূল, সম্ভব হলে মাছ, ডিম, কলিজা, মাংস বার বার বেশি পরিমাণে খেতে দিতে হবে। এ সমস্ত খাদ্য খেলে শরীরে ভিটামিন-এ এর চাহিদা মিটবে এবং গর্ভস্থ শিশুর কোন ক্ষতি হবে না।
- প্রসূতি মাকে সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ বা ৪২ দিনের মধ্যে (সম্ভব হলে শিশুর জন্মের পর পর) ২ লক্ষ আই. ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লাল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
- নবজাতক শিশুকে শালদুধ খাওয়ানোসহ ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
- শিশুদের ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে এবং ৬ মাস বয়সের পর থেকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার দিতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ভিটামিন-এ যুক্ত খাবার (মাছ, বিশেষ করে ছোট মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম), হলুদ ও গাঢ় রঙের শাক-সব্জি ও ফলমূল খেতে দিতে হবে। শিশুরা যেভাবে পছন্দ করে খাবারগুলো সেভাবে তৈরী করতে হবে। শাক সব্জি অবশ্যই পরিমাণমতো তেল দিয়ে রান্না করতে হবে, কারণ ভিটামিন-এ দেহে শোষণের জন্য তেলের প্রয়োজন হয়।
- ৬-১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে ১ লক্ষ আই.ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নীল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
- ১-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর ২ লক্ষ আই.ইউ. ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লাল রঙের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে।
- পাশাপাশি সকলকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার সর্ম্পকে পুষ্টি শিক্ষা দিতে হবে।

অধিবেশন ৪:

নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুতকরণ

৪. ১: নিরাপদ খাবার (সময়ঃ ৪০ মিনিট)

নিরাপদ খাবার হলো সেই খাবার, যা সঠিক নিয়মে পরিষ্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ করা হয় এবং খাদ্যে রোগজীবাণুর উপস্থিতির ঝুঁকি কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার করা পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাদ্য নিরাপদ ও পরিষ্কার রাখা উচিত ।

নিরাপদ পানি:

নিরাপদ পানি হলো বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন সেই পানি, যার সংস্পর্শে আমাদের ক্ষতি হয় না অর্থাৎ যে পানিতে ক্ষতিকারক দ্রব্য, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, শক্তিশালী এসিড ও ক্ষার, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর পরিমাণ স্বীকৃত ক্ষতিকারক মাত্রা থেকে কম থাকে।

নিরাপদ খাবার ও নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা:

- বাসি-পঁচা, ফাঙ্গাস পড়া বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। তা খেলে পেটের নানাবিধ সমস্যাসমূহ যেমন- হেপাটাইটিস এ এবং ই জনিত ভাইরাস রোগ দেখা দিতে পারে
- মাছি পড়া খাবার খেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হতে পারে
- কোন খাবার বা পানীয়তে কৃত্রিম রং মেশানো যাবে না। বিভিন্ন খাবারে যেসব কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় সেগুলো যদি রাসায়নিক বা কাপড়ের রং হয় তাহলে ক্যান্সার ও কিডনী রোগ দেখা দিতে পারে
- টমেটো, মটরশুঁটি, পাকা কলা, মাছ ও বিভিন্ন খাদ্যকে সতেজ বা পাকা করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় (যেমন ফরমালিন, কার্বাইড) তা থেকে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ হতে পারে
- নিরাপদ পানি ব্যবহারে পেটের পীড়া বা ডায়রিয়া, জন্ডিস, আমাশয়, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ সংক্রমন হবে না
- যে সমস্ত খাদ্য রান্না করে খাওয়া হয় না (যেমন: সালাদ, সবজি) সেগুলো নিরাপদ পানিতে ঠিকমতো ধোয়া না হলে তার মাধ্যমে এবং দূষিত পানি, মাটি অথবা আঙ্গুলের মাধ্যমে কৃমির ডিম মুখপথের মাধ্যমে অন্ত্রে প্রবেশ করে

নিরাপদ খাবার ও পানি নিশ্চিত করার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ:

১. পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন:

- হাত পরিষ্কার করে প্রতিবার খাবার তৈরি ও পরিবেশন করুন
- শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কার করার পর হাত সাবান দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করুন
- পশু পাখি পরিচর্যার পর হাত পরিষ্কার করুন
- খাওয়ার আগে এবং শিশুকে খাওয়ানোর আগে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন
- খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত বাটি, চামচ ইত্যাদি ব্যবহারের আগে সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন
- খাবার জন্য ব্যবহৃত বাসন–পত্র ধুয়ে নিন
- রান্নাঘর ও খাদ্য পোকামাকড় মুক্ত করুন
- সবসময় টাটকা খাবার নির্বাচন করুন
- হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন

২. কাঁচা এবং রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখুনঃ

- রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি আলাদা রাখুন। কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি কাটার জন্য পরিষ্কার ছুরি/বটি ব্যবহার করুন
- ঢাকনাযুক্ত পাত্রে রান্না করা খাবার রাখুন

৩. ভালভাবে সিদ্ধ করে রান্না করুনঃ

- মাংস, ডিম ভাল করে সিদ্ধ করে রান্না করুন
- পুনরায় গরম করার সময় ভালোভাবে গরম করুন। সম্ভব হলে ভাল করে ফুটিয়ে নিন
- দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করুন

৪. নিরাপদ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুনঃ

- রান্না করা খাবার ঘরের তাপমাত্রায় ২ ঘন্টার বেশী না রাখা
- খাবার রেফ্রিজারেটরে থাকলেও লম্বা সময় খাদ্য সংরক্ষণ না করা
- শিশুদের খাবার টাটকা হওয়া বাঞ্চনীয় এবং রান্নার পর সংরক্ষণ করা উচিত নয়

৫. নিরাপদ পানি ব্যবহার করুনঃ

- রান্না ও খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন
- পানি পান করার পূর্বে ফুটিয়ে নেয়া উচিত। যদি সম্ভব না হয় তাহলে ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করুন এবং পরিষ্কার পাত্রে রাখতে বলুন
- পুকুর কিংবা নদীর পানি পান না করা
- যদি কাঁচা খেতে চান তাহলে ফল ও শাক নিরাপদ পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিন
- সব্জি ও ফলমূল কাটার পূর্বে ১ চা চামচ খাবার লবণ নিরাপদ পানিতে মিশিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে শাক-সবজি ও ফলমূলে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব বহুলাংশে কমে যায়
- প্রক্রিয়াজাত, প্যাকেটজাত খাবার মেয়াদ (Expiry date) পার হলে খাবেন না

হাত ধোয়ার গুরুত্ব এবং কখন কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবেঃ

হাত ধোয়ার গুরুত্বঃ

১. খাদ্য সামগ্রী ও পানি সংক্রমিত হওয়া এড়াতে
২. মুখে জীবাণু প্রবেশ করানো এড়াতে
৩. ডায়রিয়া সংক্রমন এড়াতে
৪. কৃমির সংক্রমন এড়াতে
৫. চর্মরোগ সংক্রমন এড়াতে

কখন কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবেঃ

১. খাবার তৈরী/ রান্না করার আগে
২. কোন খাবার ধরার বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে মা/যত্নকারী ও শিশুর হাত ধুয়ে নিতে হবে
৩. পায়খানা/টয়লেট ব্যবহার করার পরে
৪. শিশুর পায়খানা পরিষ্কার করার পরে (বা অন্য কোন পায়খানা)
৫. গবাদি পশু-পাখী ধরার পরে এবং তাদের পায়খানা পরিষ্কার করার পরে

এছাড়াও নিম্নলিখিত সময়ে হাত ধোয়া আবশ্যক:

১. শিশুর সর্দি পরিষ্কার করার পরে
২. হাঁচি দেয়ার পরে
৩. কাঁচা মাছ - মাংস ধরার পরে
৪. রোগীকে দেখার আগে ও পরে
৫. ময়লা নিয়ে কাজ বা খেলা করার পরে
৬. টাকা-পয়সা ধরার পরে

ছবিঃ হাত ধোয়ার পদ্ধতি

৪. ২ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরী করা : (সময় ৩৫ মিনিট)

১. রান্নার পূর্বে এবং খাওয়ার পূর্বে ভালোভাবে হাত সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন

২. রান্নার জন্য তরকারী বড় বড় টুকরা করে কাটা উচিত, এতে খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে

৩. যে সকল খাবার সতেজ এবং ভালো তা দিয়ে খাদ্য তৈরি করুন

৪. রান্নার পুর্বে মাছ, মাংস, শাক-সব্জি, ফলমূল পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া উচিত। তা না হলে জীবাণু সংক্রামণ হতে পারে

৫. খাবার ভালভাবে রান্না করা অর্থাৎ কোন অংশ কাঁচা না রাখা-যেন সকল জীবাণু মারা যায়। মাছ, মাংস, ডিম, মুরগী ভালো তাপে রান্না করা উচিত। ডিম কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়

৬. বাসি খাবার খাওয়ার আগে পানি ফুটানোর তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করে নেয়া

৭. খাদ্য প্রস্তুতিতে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করা

৮. ধুলাবালি এড়ানোর জন্য খাদ্যের পাত্র ও রান্নার হাড়ি মেঝেতে না রাখা

৯. রান্নার জন্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র যেমন বটি, ছুরি, দা ইত্যাদি ব্যবহার করার পর ভালভাবে ধোয়া উচিত। যদি সম্ভব হয় পুনরায় ব্যবহারের জন্য তা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা

১০. খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে

পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার সংরক্ষণঃ

১. পরিষ্কার ও ঢাকনাযুক্ত পাত্রে খাবার সংরক্ষণ করা উচিত

২. সম্ভব হলে খাবার শুকনো করে রাখা উচিত (যেমন- গুড়া দুধ, চিনি, সুজি)

৩. খাবার তৈরীর ২ ঘন্টার মধ্যে খাবার খাওয়া উচিত

৪. যদি অনেকক্ষণ খাবার বাইরে থাকে, তাহলে খাবার ভালো করে গরম করে খাওয়া উচিত, যেন জীবানুর সংক্রমন না ঘটে

৫. পোকা মাকড়ের বা অন্য কোন জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য খাবার শুকনো স্থান এবং ঠাণ্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা উচিত

৬. রান্না করা খাবার ফ্রিজে বা তাকে তুলে রাখা উচিত

৭. কাঁচা মাছ, মাংস, মুরগী আলাদা স্থানে রাখা উচিত। ফ্রিজে রাখা দুধ ১ দিনের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত

৮. আয়োডিনযুক্ত লবণ সূর্য রশ্মি থেকে দূরে ঢাকনাযুক্ত কাঁচের বয়োম বা প্লাস্টিকের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং রান্নার শেষ মুহূর্তে লবণ ব্যবহার করা উচিত। বাজারের খোলা লবণ কেনা উচিত না

৯. শরীরের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি যেমন লালশাক, পুঁইশাক, মিষ্টি আলুর শাক, মিষ্টি কুমড়া ও শাক, কলমিশাক, কচুশাক ইত্যাদি খান

১০. প্রতিদিন স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় যেমন- লেবু, কলা, পেয়ারা, আম, পেঁপে ইত্যাদি যেকোন একটি মৌসুমী ফল খান

১১. মৌসুমে মাছ ভালোভাবে শুকিয়ে সারাবছর খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করুন।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি মাছ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

কাঁচা মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি মাছ করা হয়, এতে-

- মাছের অপচয় রোধ হয় অর্থ্যাৎ মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ পচে নষ্ট হতে পারে না
- সারাবছর বিশেষ করে দূর্যোগকালীন সময়ে মাছ খাওয়া নিশ্চিত হয়
- মাছের শুঁটকি উৎপাদন বিকল্প আয়ের উৎস হতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি মাছ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

কাঁচা মাছের পরিচর্যা

- কম চর্বিযুক্ত টাটকা মাছের পাখনা, আঁইশ, ফুলকা ও নাড়িভূড়ি ফেলে দিয়ে মাছ টিউবওয়েলের পানিতে ধুঁয়ে নিন
- বড় মাছ হলে মেরুদণ্ড বরাবর দুই পাশে লম্বালম্বি করে অথবা কাটার দুইদিকে আড়াআড়ি করে চিড়ে ফেলুন
- মাছে পরিষ্কার লবণ (১০ কেজি মাছে ১ কেজি) মেখে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফ দিয়ে ৬-৮ ঘন্টা রেখে দিন
- লবণ মিশ্রিত মাছ বড় বালতি বা গামলায় পরিষ্কার পানিতে পাঁচ মিনিট ডুবিয়ে ধুঁয়ে নিন
- মরিচ ও হলুদের গুড়া (১০ কেজি মাছে ১০-৩০ গ্রাম) একত্রে মিশিয়ে মাছে মেখে নিন।

কাঁচা মাছের পরিচর্যা

মাছ শুকানো

খুব ভোরে বাঁশের মাচা বা ডালায় হলুদ মাখানো মাছ ঘন মশারি নেট দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে রোদে শুকাতে দিন।

মাছ শুকানো

শুঁটকি মাছ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

ভালোভাবে শুকানো শুঁটকি মাছ ঠাণ্ডা অবস্থায় ঢাকনাওয়ালা ড্রাম বা শক্ত পলিথিন ব্যাগে ভরে ফেলুন বাজারজাত করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব বায়ুরোধী পলিথিন ব্যাগে (বড় মাছ সুবিধামতো আকারে ছোট ছোট টুকরো করে) ভরে তৎক্ষণাৎ চূড়ান্ত প্যাকেট তৈরি করুন।

শুঁটকি মাছ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

অধিবেশন ৫:

বয়স অনুযায়ী পুষ্টি চাহিদা

৫.১ শিশুর পুষ্টি (০-২৪ মাস)

৫.২ কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি

৫.৩ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টি চাহিদা এবং তা নিশ্চিতকরণ এর উপায়সমূহ জানতে পারবেন

৫.১: ০-২৪ মাস বয়সী শিশুর পুষ্টি

শিশুর জন্মের পর থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত প্রথম দুই বছর শিশুর সার্বিক বিকাশ (শারীরিক ও মানসিক) এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা গর্ভধারনের পর থেকে শিশুর বয়স দুই বছর হওয়া পর্যন্ত মোট ১০০০ দিনকে সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার বলা হয়। এ সময় মা ও শিশুর যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারলে তা সারা জীবনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। জন্মের সাথে সাথেই শিশুকে বুকের দুধ টানতে দেয়ার মাধ্যমে যে পুষ্টি সরবরাহ শুরু হয় তা পূর্ণ ৬ মাস বয়সে বাড়তি খাবার শুরু করার মাধ্যমে জোরদার হয় এবং দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।

৫.১.১ মায়ের দুধের খাওয়ানোর উপকারিতা এবং না খাওয়ানোর অপকারিতা (মায়ের ও শিশুর)

এই কার্যক্রম শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা এবং না খাওয়ানোর অপকারিতা বলতে পারবেন

কার্যক্রম ১: শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা (মায়ের ও শিশুর)

কার্যক্রম ২: শুধুমাত্র মায়ের দুধ না খাওয়ানোর অপকারিতা নিয়ে আলোচনা (মায়ের ও শিশুর)

মোট সময়: ৩০ মিনিট

কার্যক্রম ১: শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে ২টি দলে ভাগ করে দেবেন। ১ম দলকে "শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশুর কি কি উপকার হয়" এবং ২য় দলকে "শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে মায়ের কি কি উপকার হয়" বলতে বলবেন। তাদের সঠিক ধারণার প্রশংসা করবেন এবং যেগুলো সঠিক নয় সেগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবেন।

শিশুর জন্য মায়ের দুধের উপকারিতা:

১. ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিশুর যেসব পুষ্টির প্রয়োজন তার সবটুকু পাওয়া যায় মায়ের দুধে।

২. শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ভালোভাবে হয় এবং শিশু বুদ্ধিমান হয়।

৩. শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ফলে বিভিন্ন অসুখ যেমন ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, কানপাকা, এলার্জি ইত্যাদি রোগ কম হয়।

৪. মায়ের দুধ শিশুর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। এটি সঠিক তাপমাত্রায় থাকে, সহজে হজম হয় এবং যেকোন সময়ে খাওয়ানো যায়।

মায়ের জন্য শিশুকে দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা:

১. মায়ের প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ কম হয়

২. প্রসব পরবর্তী সময় মায়ের জরায়ু তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরে আসে

৩. মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক ভাল হয়

৪. মায়ের স্তন, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে

৫. মায়ের সময় বাঁচে ও ঝামেলা কম হয়

পরিবারের জন্য শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা:

১. বাড়তি দুধ কেনার খরচ বাচে। শিশুর অসুখ কম হয়, ফলে চিকিৎসা ও যাতায়াতের খরচও কম হয়।

কার্যক্রম ২ঃ শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ানোর অপকারিতা নিয়ে আলোচনা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে ২টি দলে ভাগ করে দেবেন। ১ম দলকে "শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ালে শিশুর কি কি অপকার হয়" এবং ২য় দলকে "শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ালে মায়ের কি কি অপকার হয়" বলতে বলবেন। তাদের সঠিক ধারণার প্রশংসা করবেন এবং যেগুলো সঠিক নয় সেগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবেন।

শিশুর জন্য শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ানোর অপকারিতা:

১. শিশু তার দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরণের পুষ্টি পায় না, ফলে বয়স অনুপাতে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি হয় না (ওজন ও উচ্চতা)।

২. শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে শিশু বারে বারে অসুখে আক্রান্ত হয়, যেমন ডায়রিয়া, সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, কানপাকা, এলার্জি, ইত্যাদি। অসুখের ফলে আবার শিশুর দেহে অপুষ্টি দেখা দেয় এবং শিশু পুনরায় অসুখে আক্রান্ত হয়। এভাবে বার বার শিশু রোগাক্রান্ত হয় এবং উত্তরোত্তর অপুষ্টির শিকার হয়।

৩. শিশুর মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।

৪. শিশুর বুদ্ধির বিকাশ কম হয়, ফলে পরিনত বয়সে কর্মক্ষমতা কমে যায়।

৫. মায়ের দুধ ছাড়া অন্যান্য খাবার যেমন কৌটা বা গরুর দুধ সবসময় নিরাপদ নয়, এতে ভেজাল মিশ্রিত থাকার আশংকা থাকে।

৬. যারা মায়ের দুধ কম খায় তাদের পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ বেশী হয়।

শিশুকে দুধ না খাওয়ালে মায়ের অপকারিতা:

১. মায়ের প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বেশী হয়।

২. জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেরী হয়।

৩. মায়ের স্তন, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

৪. বাইরের দুধ তৈরী করতে মায়ের অনেক সময় নষ্ট হয়, এছাড়াও দুধ কেনা, বোতল কেনা, পানি ফুটানোর জন্য জ্বালানি ইত্যাদির খরচ বাড়ে।

৫.১.২ জন্মের পরপরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করার গুরুত্বঃ

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- জন্মের পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বুকের দুধ ছাড়া বাইরের খাবার কেন শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা জানতে পারবেন।

কার্যক্রম ১: জন্মের পরপরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করার গুরুত্ব সর্ম্পকে আলোচনা

মোট সময়: ৩০ মিনিট

জন্মের পরপরই মায়ের দুধ খাওয়ানো আরম্ভ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং তাদের মতামত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। যেসব বিষয় বাদ পড়ে গেছে সেসব বিষয়েও জানাবেন।

জন্মের পরপরই কেন বুকের দুধ বা শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে?

- জন্মের পরপরই অন্ততঃ পক্ষে প্রথম ১ ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে শালদুধ খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে এ সময় শিশুকে অন্য কোন খাবার যেমন মধু, মিশ্রির পানি, তেল, ইত্যাদি দেয়া যাবে না। শালদুধ মায়ের স্তন থেকে বের হওয়া প্রথম দুধ, যা ঘন ও আঠালো। এই ঘন দুধ শিশুর জন্য খুবই পুষ্টিকর এবং পরিমানে অল্প হলেও যথেষ্ট। এছাড়াও শালদুধে প্রচুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে যা শিশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে।
- জন্মের পরপরই শিশুর চুষে খাওয়ার ক্ষমতা খুবই ভালো থাকে, তাই মায়ের বুকে শিশুকে দিলে শিশু নিজে নিজেই মায়ের বুকের দুধ চুষতে থাকবে। যদি দেরিতে মায়ের বুকে দেওয়া হয় তাহলে শিশু মায়ের দুধ চোষা ভুলে যাবে, ফলে পরবর্তীতে মায়ের বুকে দুধ বেশী আসলেও শিশু আর তা মুখে নিতে চাইবে না বা টেনে খেতে চাইবে না। তাই শালদুধ ছাড়া শিশুকে অন্য কিছু দেওয়া যাবে না। শিশু যত ঘনঘন মায়ের দুধ চুষবে তত তাড়াতাড়ি দুধের প্রবাহ বাড়বে বা নামবে।
- দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের বুকের সাথে শিশুর শরীর লেগে থাকে ফলে শিশুর শরীর গরম থাকে।

শালদুধের গুরুত্ব:

- শালদুধে শিশুর শরীরের চাহিদা অনুযায়ী সবধরণের পুষ্টি পাওয়া যায় অর্থাৎ জন্মের পরপর শিশুর যতটুকু পুষ্টির প্রয়োজন এবং পেট ভরার জন্য যে পরিমান দুধের প্রয়োজন তা সবই শালদুধে সঠিক পরিমানে আছে।
- শালদুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফলে শিশু বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পায়।
- শিশুকে শালদুধ দেওয়ার আগে বা পরে কোন কিছু যেমন মধু, চিনির পানি, সরিষার তেল, মিশ্রির পানি, বার্লি, গরুর দুধ, কৌটার দুধ বা বাইরের অন্য কোন খাবার একেবারেই দেয়া যাবে না। এগুলো শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এছাড়াও জন্মের পরে সরিষার তেল, পানি বা অন্য কোন কিছু দিয়ে শিশুর মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই।
- নবজাতকের পেট/পাকস্থলী প্রথম কয়েকদিন খুবই ছোট থাকে (ছোট মার্বেলের মতো), তাই অন্য কোন খাবার দিলে শিশুর পেট ভরে যাবে, ফলে মায়ের দুধ আর চুষতে চাইবে না। নবজাতকের পেট যেহেতু খুবই ছোট থাকে তাই প্রথম কয়েক দিন মায়ের বুক থেকে যতটুকু দুধ বের হয় ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট, এই কথাটি আপনি প্রসবের সময় ধাত্রী, মা-বাবা, প্রতিবেশি, পরিবারের দাদী-নানি বা অন্য যেকোন মুরুব্বী থাকলে তাঁদেরও বুঝিয়ে বলবেন।
- জন্মের পরপরই বুকের দুধ চুষতে দিলে মায়ের গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়ে যায় এবং মায়ের রক্তক্ষরণ কম হয়।
- শিশুর প্রথম কালো পায়খানা দ্রুত বের হতে সাহায্য করে।

৫.১.৩ মায়ের দুধ খাওয়ানোর নীতিমালা

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুর জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর নীতিমালা বলতে পারবেন।

মোট সময়: ২০ মিনিট

১. জন্মের সাথে সাথে (প্রথম ১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ দিন। জন্মের পরপরই শিশুর জন্য মায়ের শালদুধ প্রয়োজন। তাই যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে শালদুধ দিন। এ সময় শিশুর মুখে মধু, চিনির পানি, সরিষার তেল, মিশ্রির পানি, কৌটার দুধ, গরুর দুধ বা অন্য কোন খাবার একেবারেই দেয়া যাবে না।

২. জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ দিন।

৩. এ সময়ে শিশুর পূর্ণাঙ্গ শারিরীক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পুষ্টি সঠিক পরিমানে পাওয়া যায় মায়ের দুধে। তাই শিশুর পূর্ণ ৬ মাস (১৮০ দিন) বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধই যথেষ্ট, এ সময় এমনকি আলাদা করে শিশুকে এক ফোঁটা পানিও খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

৪. ৭ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং প্রথম দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধও খাওয়াতে হবে।

৫. শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হয়ে ৭ মাসে পড়লে (১৮১ দিন থেকে) মায়ের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টিকর খাবার সঠিক পরিমানে খাওয়াতে হবে। এ সময় থেকে শিশুর শরীরের পুষ্টির চাহিদা শুধুমাত্র মায়ের দুধে পূরণ হয় না, তাই পাশাপশি অন্যান্য খাবারের প্রয়োজন হয়। শিশুরা এই বয়স থেকে ঘন/অর্ধতরল খাবার গিলতে শেখে এবং হজম করতেও পারে। মনে রাখতে হবে শিশুকে কমপক্ষে প্রথম ২ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তি খাবারের পাশাপশি মায়ের দুধ খাওয়ানোও চালিয়ে যেতে হবে।

৬. অসুস্থ শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার বার বার খেতে দিতে হবে।

৫.১.৪: বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা ও শিশুর অবস্থান (পজিশন) এবং মায়ের বুকে শিশুর সংস্থাপন (এটাচমেন্ট) পর্যবেক্ষণ করার নিয়ম

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা ও শিশু দুইজনকেই পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন বুঝতে পারবেন:
  - শিশুকে সঠিকভাবে ধরা হয়েছে কিনা
  - মায়ের বুকে শিশু সঠিকভাবে লেগে আছে কিনা
  - শিশু ভালোভাবে দুধ পাচ্ছে কি না
- শিশু সঠিকভাবে মায়ের বুকে লেগে থাকার ৪টি মূল তথ্য বলতে পারবেন।
- মায়ের বিভিন্ন রকম অবস্থান, যেমন- বসা, শোয়া এবং যমজ শিশুকে দুধ খাওয়ানো কৌশল দেখাতে পারবেন।

কার্যক্রম ১: দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুকে সঠিকভাবে ধরা এবং মায়ের বুকে শিশুকে সঠিকভাবে লাগানোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

কার্যক্রম ২: পুতুলের সাহায্যে সঠিকভাবে শিশুকে ধরা দেখানো এবং তা হাতে কলমে করা।

কার্যক্রম ৩: মায়ের বুকে শিশুর লেগে থাকা পর্যবেক্ষণ করার উপায় বর্ণনা করা।

কার্যক্রম ৪: সঠিক অবস্থান (পজিশন) এবং সংস্থাপন (এটাচমেন্ট) এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

মোট সময়: ৪৫ মিনিট

প্রয়োজনীয় উপকরণ: পুতুল ও বালিশ

কার্যক্রম ১: দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুকে সঠিকভাবে ধরা এবং মায়ের বুকে শিশুকে সঠিকভাবে লাগানোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন সঠিকভাবে ধরা বলতে কি বোঝায়, এর উপকারিতা ও কিভাবে বোঝা যাবে ধরা সঠিক হয়েছে।
- মায়ের বুকে শিশুকে সঠিকভাবে লাগানোর গুরুত্ব কি এবং সঠিকভাবে না লাগালে কি সমস্যা হতে পারে তা বুঝিয়ে বলবেন।

মায়ের বুকে শিশুর সঠিকভাবে লেগে থাকার গুরুত্ব:

- শিশু মায়ের বুকে সঠিকভাবে লেগে থাকলে সহজে দুধ চুষতে পারবে ও যথেষ্ট পরিমানে দুধ টেনে খেতে পারবে, এতে করে মায়ের বুকে দুধের পরিমানও বাড়বে। শিশু যদি মায়ের বুকে সঠিকভাবে লেগে না থাকে, তবে সে সহজে দুধ টেনে খেতে পারবে না, ফলে শিশুর পেট ভরবে না এবং শিশু কান্নাকাটি করবে। অন্যদিকে মাও মনে করবেন যে তার বুকে যথেষ্ট পরিমানে দুধ নেই।

- শিশু মায়ের বুকে সঠিকভাবে না লেগে দুধ খেলে মায়ের স্তনে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা দেখা দেয় যেমন- স্তনের বোঁটা ফাটা, স্তন ফোলা, ইত্যাদি।

কার্যক্রম ২: পুতুলের সাহায্যে সঠিকভাবে শিশুকে ধরা দেখানো এবং তা হাতে কলমে করা

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সামনে শিশুকে ভুলভাবে ধরে দেখাবেন, যেমন- মায়ের সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা, শিশুর পেট মায়ের পেট থেকে দূরে থাকা, ইত্যাদি। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন তিনি কি কি ভুল করেছেন।
- সহায়ক পুতুলের সাহায্যে মায়ের বিভিন্ন রকমের অবস্থান, যেমন- বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় ও যমজ শিশুকে একসাথে কিভাবে দুধ খাওয়াতে হয় তা দেখাবেন।
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পুতুলের সাহায্যে সহায়ক বার বার সঠিকভাবে ধরা চর্চা করাবেন।

মা ও শিশুর সঠিক অবস্থান (পজিশন):

- মা বসা বা শোয়া যেকোন আরামদায়ক অবস্থায় আছেন কি না তা ভালভাবে দেখুন। মা যদি বসে দুধ খাওয়াতে আরাম বোধ করেন, তাহলে দেয়াল বা খাটের দিকে হেলান দিয়ে আরাম করে বসাবেন।
- শিশুকে দুধ দেওয়ার সময় প্রথমেই শিশুর শরীর মায়ের দিকে ঘুরিয়ে নিবেন এবং শিশুর মুখ মায়ের স্তনের কাছে নিয়ে আসবেন। লক্ষ্য করবেন, মা যেন শিশুর দিকে ঝুঁকে স্তন এগিয়ে না দেয়, বরং শিশুকে মায়ের দিকে এগিয়ে আনবেন। অর্থাৎ শিশুর শরীর ও মুখ মায়ের স্তনের দিকে ফেরানো থাকবে, এতে করে শিশু ও মা দু'জন দু'জনের মুখ দেখতে পারবে।
- শিশুকে এমনভাবে ধরবেন যাতে শিশুর ঘাড় ও মাথা মায়ের একহাতের কনুই এর ভাঁজের উপর থাকে। প্রয়োজন বোধে মায়ের কোলের উপর বালিশ রেখে তার উপর শিশুকে রাখবেন, এতে করে শিশু নিচের দিকে নেমে যাবে না এবং শিশুর হাত ও মায়ের হাত ঝুলে থাকবে না। মায়ের বুকের সাথে শিশুর বুক ও পেট লাগানো থাকবে। খেয়াল করতে হবে শিশুর মাথা, ঘাড় ও পাছা অর্থাৎ পুরো শরীর যেন সোজা বা এক লাইনে থাকে।
- মায়ের স্তন যদি ভারী বা বড় হয়, তবে মাকে এক হাত দিয়ে 'C' এর মতো করে স্তন ধরতে শিখিয়ে দিবেন। বুকের নিচে হাতের চার আঙ্গুল রাখতে বলবেন এবং বুড়ো আঙ্গুল স্তনের উপর হালকাভাবে রাখতে বলবেন। 'কাঁচি'র মতো করে স্তন ধরা উচিত নয়, এতে করে দুধের নালীর উপর চাপ পড়ে এবং দুধের প্রবাহ কমে যায় ও শিশু দুধ কম পায়।

ছবি : শোয়া অবস্থান

ছবি : বসা অবস্থান

ছবি: 'C' এর মত করে স্তন ধরা

কার্যক্রম ৩ : মায়ের বুকে শিশুর লেগে থাকা পর্যবেক্ষণ করার উপায় বর্ণনা করা

- সহায়ক মায়ের বুকে শিশুর লেগে থাকার বা সংস্থাপনের ৪টি মূল তথ্য নিয়ে আলোচনা করবেন।
- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রথমে বই এর ছবির মাধ্যমে ও পরে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুকে সঠিক ভাবে সংস্থাপন দেখাবেন।

মায়ের বুকে শিশুর সংস্থাপনের ৪টি মূল তথ্য ও পর্যবেক্ষণ প্রনালী:

১. মায়ের বুকের বোঁটা দিয়ে শিশুর নাকের নিচে এবং উপরের ঠোঁটের মাঝখানে বার বার ছোঁয়াবেন, এতে করে শিশু বড় করে হাঁ করবে (ছবি ক, খ)। শিশু বড় করে হাঁ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ছবি ক: স্তনের বোঁটা শিশুর নাকের নিচে লাগানো

ছবি খ: বড় করে হাঁ করা

ছবি গ: স্তনের বোঁটাসহ কালো অংশ মুখে দেয়া

২. শিশু যখন বড় করে হা করবে ঠিক তখনই স্তনের বোঁটাসহ কালো অংশ শিশুর মুখের ভিতর দিতে হবে (ছবি গ), কারণ বোঁটার চারদিকের কালো অংশের ভিতরে বেশী দুধ জমা থাকে বা দুধের নালীগুলো চওড়া থাকে।

৩. শিশুর থুতনি ও নাক মায়ের স্তনের সাথে লেগে থাকবে (ছবি ঘ)। শিশুর নিচের ঠোঁট বাইরের দিকে উল্টানো থাকবে।

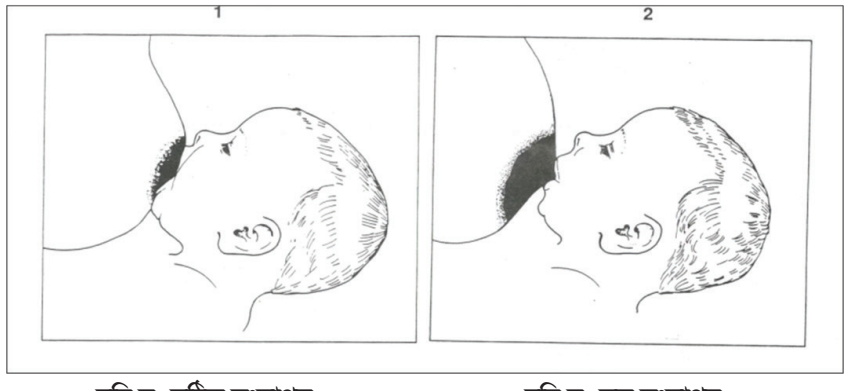

ছবি ঘ: সঠিক সংস্থাপন **ছবি ঘ: ভুল সংস্থাপন**

ছবি ঘ: সঠিক সংস্থাপন **ছবি ঘ: ভুল সংস্থাপন**

৪. মায়ের স্তনের কালো অংশ যদি বেশী বড় হয় তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে, কালো অংশের নিচের দিক যেন পুরোপুরি শিশুর মুখে যায়, উপরের দিকের একটু অংশ বের হয়ে গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

যমজ শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি :

একজন মা একইসাথে দুইজন শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় দুধ তৈরি করতে পারেন। কারণ দেখা যায় যখন শিশু মায়ের এক স্তন চুষতে থাকে তখন অন্য স্তন থেকে দুধ পড়তে থাকে। এছাড়াও শিশু যতো বেশি স্তন চোষে ততো বেশি দুধ তৈরি হয়, অর্থাৎ শিশুর চাহিদা অনুযায়ী মায়ের দুধ তৈরি হয়। তাই যমজ শিশু হলেও একজন মা সহজেই ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ দিয়ে শিশুদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারেন। দুই শিশুকে একইসাথে দুই স্তনে লাগাতে হবে যাতে করে দুইজন একসাথে দুধ খেতে পারে। এতে দুটি সুবিধা হয়, অন্য স্তনের দুধ পড়ে নষ্ট হয় না এবং মায়ের দুধ খাওয়াতে সময়ও কম লাগে। তবে এক্ষেত্রে বাড়ির সকলের এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা পেলে মায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং মা সফলভাবে যমজ শিশুদের একসাথে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিশুকে ধরার নিয়ম ছবিতে দেখানো হলো (ছবি ক, খ, গ)।

ছবি ক: ফুটবল

ছবি খ: ক্রস

ছবি গ: সমান্তরাল

৫.১.৫ : ভিডিও প্রদর্শন ১) মায়ের দুধ খাওয়ানো ও ২) হাত দিয়ে বুকের দুধ গেলে বের করা এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

এই ভিডিও প্রদর্শন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা শিশুকে কিভাবে ধরবেন তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।
- শিশু মায়ের স্তন কিভাবে ধরবে ও দুধ চুষে খাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে কিভাবে হাত দিয়ে চেপে মায়ের বুকের দুধ বের করতে হয়, কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, কেমন পাত্র ব্যবহার করতে হয়, কতক্ষণ রেখে দেয়া যায়, চামচ দিয়ে কিভাবে খাওয়াতে হয় তা শিখতে পারবেন।
- একজন মাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে হাতে কলমে সাহায্য করতে পারবেন ও শিখাতে পারবেন।

কার্যক্রম ১: ভিডিও প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা।

কার্যক্রম ২: দুধ বের করার প্রয়োজনীয়তা এবং কাপ/চামচে করে দুধ খাওয়ানো শিক্ষা।

কার্যক্রম ৩: বুকের দুধ গেলে বের করার জন্য পাত্র নির্বাচন ও মায়ের করণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা।

কার্যক্রম ৪: কাপে/চামচে করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শিক্ষা।

মোট সময়: ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট (প্রয়োজনে ২ বার ভিডিওটি দেখাবেন)

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টিভি, ভিডিও প্লেয়ার ও ভিডিও ক্যাসেট। প্রয়োজনে বিদ্যুৎ এর পরিবর্তে ব্যাটারিচালিত টিভি ও ভিডিও প্লেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কার্যক্রম ১: ভিডিও প্রদর্শন এর উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন প্রশিক্ষণে যা যা জানছেন বা হাতে কলমে করে শিখছেন তারই কিছু অংশ নিয়ে এই ভিডিওটি তৈরী।
- সহায়ক আরো বলবেন, যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা এখন পর্দায় দেখলে মনে রাখতে সুবিধা হবে। কানে শোনা, চোখে দেখা এবং হাতে কলমে করা এই তিনটি পদ্ধতি মিলিয়ে এই প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো পরবর্তীতে তাদের কাজে অনেক সাহায্য করবে।
- একজন স্বাস্থ্যকর্মী কিভাবে শিশুকে মায়ের বুকে সঠিকভাবে লাগাতে সাহায্য করছেন তা ভালোভাবে দেখবেন।
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ৪টি মূল তথ্য ভালোভাবে দেখবেন এবং মনে রাখবেন।
- বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে বুকের দুধ গেলে বের করা পর্যবেক্ষণ করবেন ।
- মা যদি মনে করেন তার বুকের দুধ কম, তবে তার সমাধানগুলো ভালোভাবে শুনবেন।
- সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সেশন শেষ করবেন।

কার্যক্রম ২: দুধ বের করার প্রয়োজনীয়তা এবং কাপ/চামচে করে দুধ খাওয়ানো শিক্ষা

- একজন মায়ের কখন বুকের দুধ বের করতে হবে তা বলতে ও বুঝতে পারবেন।
- হাত দিয়ে চেপে দুধ বের করার বিভিন্ন কৌশল শিখতে এবং প্রশিক্ষণ শেষে মায়েদের সাহায্য করতে পারবেন।
- গেলে বের করা দুধ কেমন পাত্রে রাখবেন এবং কতক্ষণ রেখে খাওয়ানো যাবে তা শিখতে পারবেন ।

বিভিন্ন অবস্থায় মায়ের বুকের দুধ বের করে শিশুকে খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়, যেমন শিশু যখন প্রয়োজনমতো মায়ের দুধ চুষে বা টেনে খেতে না পারে, তখন তাকে মায়ের বুকের দুধ গেলে বের করে খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে মায়ের দুধ অসুস্থ শিশুর জন্য অতি প্রয়োজনীয়। অসুস্থ অবস্থায় মায়ের দুধ শিশুকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলে। যে অবস্থায় শিশু মায়ের দুধ ঠিকমতো টেনে খেতে না পারে তা হলো:

১. কম ওজনের জন্ম শিশু
২. সময়ের আগে জন্ম নেওয়া অপরিণত শিশু
৩. জন্মগত ত্রুটি (ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, ইত্যাদি)
৪. নিউমোনিয়া, কাশি, সর্দিতে নাক বন্ধ থাকা
৫. অতিরিক্ত ডায়রিয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়া

মায়ের সমস্যার কারণেও মাঝে মাঝে মায়ের দুধ গেলে শিশুকে খাওয়াতে হয়, যেমন:

১. দুধ জমে স্তন ফুলে গেলে
২. স্তনের বোঁটা ফেটে গেলে বা ঘা হলে
৩. স্তনের বোঁটা ভিতরের দিকে ঢুকানো থাকলে

চাকুরিজীবি মায়েরা যারা বেশ বড় একটা সময় বাড়ির বাইরে থাকেন তারা শিশুর জন্য দুধ গেলে সংরক্ষণ করে রেখে যেতে পারেন, যা পরবর্তীতে শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়াও কর্মজীবি মায়েরা তাদের কর্মস্থলে থাকাকালীন স্তন থেকে দুধ চুইয়ে পড়া রোধ করতে দুধ গেলে তা সংরক্ষণও করতে পারেন এবং পরবর্তীতে শিশুকে খাওয়াতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, দুধ সংরক্ষণ করতে হলে অবশ্যই ফ্রিজ থাকতে হবে (অফিসে ও বাসায়)।

কার্যক্রম ৩: বুকের দুধ গেলে বের করার জন্য পাত্র নির্বাচন ও মায়ের করণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দুধ গেলে রাখা শিক্ষা দেয়ার আগে ২টি বিষয় শিক্ষা দেবেন:

১. দুধ রাখার পাত্রটি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার পদ্ধতি

২. সাবান দিয়ে মায়ের নিজের হাত ধুয়ে নেয়ার পদ্ধতি। এরপর হাত দিয়ে দুধ গেলে রাখার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন।

১. একটি বড় মুখের বাটি বা পাত্র নিতে হবে। বাটি বা পাত্রটিকে ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ২০ মিনিট চুলায় গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে, এতে করে সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হবে।

২. দুধ গেলে রাখার আগে মা ভালভাবে সাবান দিয়ে নিজের হাত ধুয়ে নেবেন, যাতে করে হাতে কোন রোগ জীবানু লেগে না থাকে।

৩. মা আরাম করে বসবেন। দুধ গালার পূর্বে সম্ভব হলে শিশুকে কিছু সময় স্তন চুষতে দিতে হবে, এতে করে দুধের প্রবাহ বাড়বে। কোন কারণে শিশু দুধ চুষতে না পারলে দুই হাত দিয়ে কিছুক্ষণ স্তন মালিশ (ম্যাসাজ) করতে হবে, তাহলে ভালভাবে দুধ আসবে (ছবি ক ও খ)।

৪. বুড়ো আঙ্গুল স্তনের উপরের দিকে ও বাকি চারটি আঙ্গুল নিচে রেখে 'C' এর মতো করে স্তনকে একটু ভিতরের দিকে হালকাভাবে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বার বার চাপ দিয়ে আবার ছাড়তে হবে, এভাবে বার বার করতে হবে। প্রথমে দুধ না আসলেও পরে ফোঁটায় ফোঁটায় দুধ বের হয়ে আসবে। এই পদ্ধতিতে ব্যথা পাবার কথা নয়। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে পদ্ধতিতে কোন ভুল আছে (ছবি ক)।

ছবি ক: উপর থেকে নিচে

ছবি খ: বৃত্তাকারে মালিশ

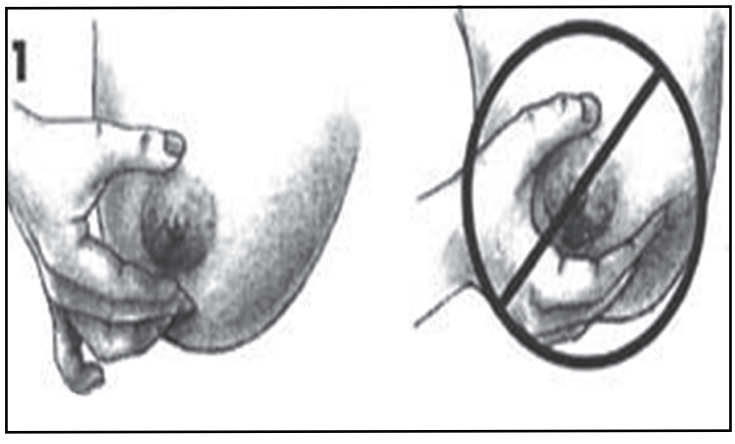

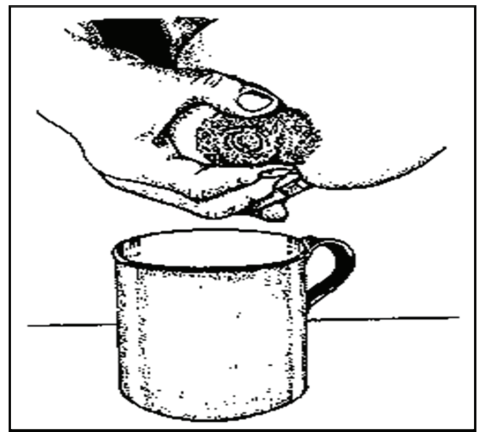

ছবি ক: স্তনে চাপ দিয়ে দুধ বের করা

৫. স্তনের কালো অংশে চাপ দিয়ে দুধ বের করতে হবে, বোঁটায় নয়। বোঁটায় চাপ দিলে দুধ বের হয় না।

৬. স্তনের বিভিন্ন অংশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে দুধ বের করতে হবে (ছবি ক ও খ)।

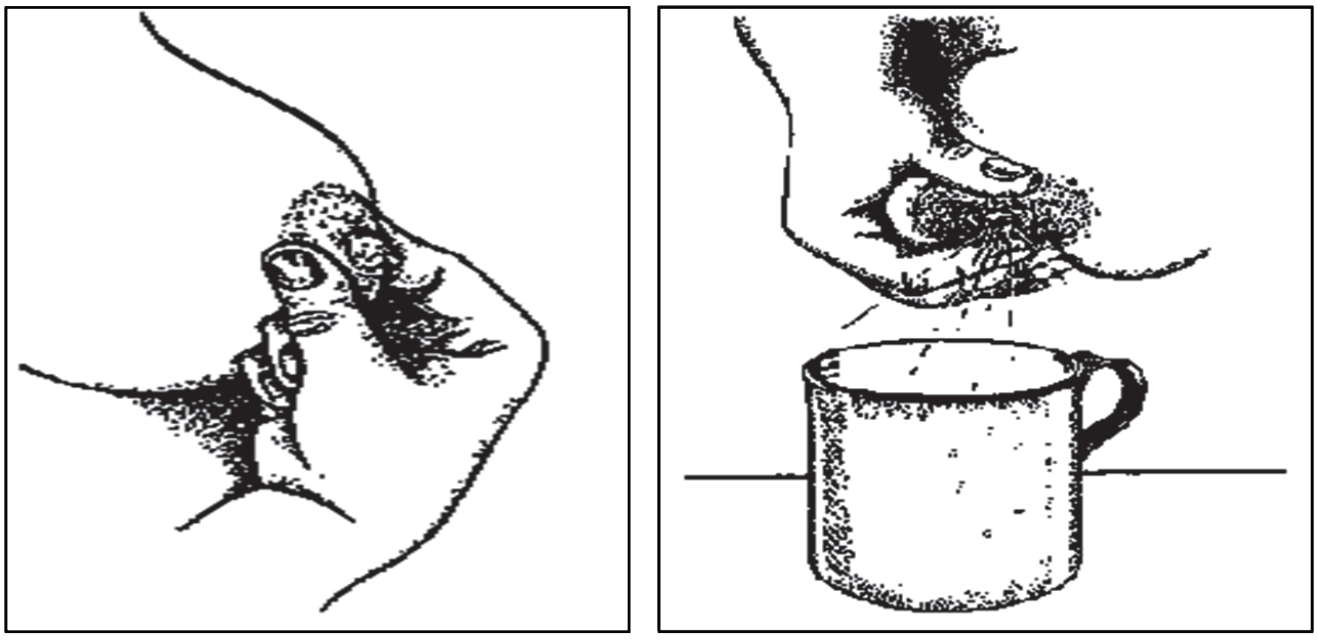

ছবি খ: স্তনের বিভিন্ন অংশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুধ বের করা

৭. এক স্তন থেকে কমপক্ষে ৩-৫ মিনিট পর্যন্ত দুধ বের করা যেতে পারে এবং সেই স্তনের দুধ যখন শেষ হয়ে আসবে তখন অন্য স্তন থেকে দুধ বের করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে দুধ গেলে বের করতে ২০-৩০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়।

কার্যক্রম ৪: কাপে/চামচে করে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শিক্ষা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের গালানো বা বের করা বুকের দুধ কিভাবে কাপ বা চামচের সাহায্যে শিশুকে খাওয়াতে হবে তা পুতুলের সাহায্যে দেখাবেন। শিক্ষা শুরুর আগে সহায়ক হাত ভালো করে ধুয়ে নিবেন।

- শিশুকে সোজা করে বা আধশোয়া করে কোলে বসান। একবারে যতটুকু দুধ দেবেন ততটুকু চামচে বা কাপে নিন। কাপ/চামচ হালকা করে শিশুর নীচের ঠোঁটে ধরুন। শিশুর ঠোঁটে কাপ/চামচের ছোঁয়া লাগলে শিশু মুখ হা করবে এবং জিহ্বা দিয়ে মুখে দুধ নিতে থাকবে। এভাবে অল্প অল্প করে দুধ চুষে খেয়ে ফেলবে।
- কাপ/চামচটিকে অল্প একটু কাত করে ধরুন যাতে অল্প একটু দুধ শিশুর ঠোঁটে লাগে। শিশুর মুখে সরাসরি দুধ ঢালবেন না। হালকা করে কাপ/চামচটিকে শিশুর ঠোঁটে ধরলে সে নিজেই খেতে থাকবে (ছবি ক)।

ছবি-ক: কাপের সাহায্যে শিশুকে খাওয়ানো

কার্যক্রম ৫: বুকের দুধ গেলে বের করে তা সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আলোচনা

১. গালানো বা বের করা দুধ একটি পরিষ্কার চিনামাটির বা কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করবেন এবং কাঁচের পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

২. ঘরের ভিতরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বুকের দুধ ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায়।

৩. শিশুকে যখন খাওয়াতে হবে তখন একবারে যতটুকু দুধ সে খাবে ততটুকু দুধ বাটিতে নেবেন এবং বাটিটি হালকা গরম পানিতে কিছুক্ষণ রেখে দুধটুকু হালকা গরম করে নিতে হবে। এ দুধ আগুনে বা চুলায় গরম করা যাবে না, এতে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. ১.৬: স্তনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান

সময়: ১ ঘন্টা

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুকে মায়ের স্তনে সঠিকভাবে না লাগালে স্তনের কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে তা জানতে পারবেন ও তার সমাধান শিখবেন এবং পরবর্তীতে মাকে হাতে কলমে সাহায্য করতে পারবেন।
- মা শিশুকে যাতে সফলভাবে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ এবং দুই বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তি খাবারের পাশাপাশি বুকের দুধ খাওয়াতে পারে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।
- কিভাবে বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

শিশুকে সঠিকভাবে না ধরলে বা মায়ের সাথে শিশুর অবস্থান সঠিক না হলে শিশু মায়ের স্তন সঠিকভাবে মুখে নিতে পারে না অর্থাৎ সংস্থাপনও সঠিক হয় না, ফলে শিশু ভালোভাবে বুকের দুধ টেনে খেতে পারে না। আর শিশু ভালোভাবে মায়ের দুধ খেতে না পারলে মায়ের স্তনের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

১. স্তনের বোঁটা ফাটা

অনেক মা জানেন না কিভাবে শিশুকে স্তনে লাগাতে হয়, তারা মনে করেন স্তনের বোঁটা চুষলেই দুধ পাওয়া যায়। এ ধারণা সঠিক নয়। এর ফলে একদিকে যেমন শিশু প্রয়োজনমতো মায়ের দুধ পায় না অন্যদিকে তেমন স্তনেও সমস্যা দেখা দেয়, যেমন স্তনের বোঁটা ফাটা। শিশু যখন শুধু বোঁটা চুষতে থাকে (অর্থাৎ স্তনের বোঁটার চারপাশের কালো অংশ ছাড়া) তখন শিশু ভালভাবে দুধ পায় না। বেশী দুধ পাওয়ার জন্য শিশু স্তনের বোঁটা অতিরিক্ত চুষতে থাকে। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে বোঁটার চারপাশের চামড়া ফেটে লাল হয়ে যায় এবং বোঁটায় ক্ষত বা ঘা-এর সৃষ্টি হয়। বোঁটার চামড়া ফেটে গেলে তা দিয়ে জীবাণু স্তনের ভিতর প্রবেশ করতে পারে এবং তখন খুব ব্যথা হয় এবং রক্তক্ষরণও হতে পারে (ছবি: ৯)।

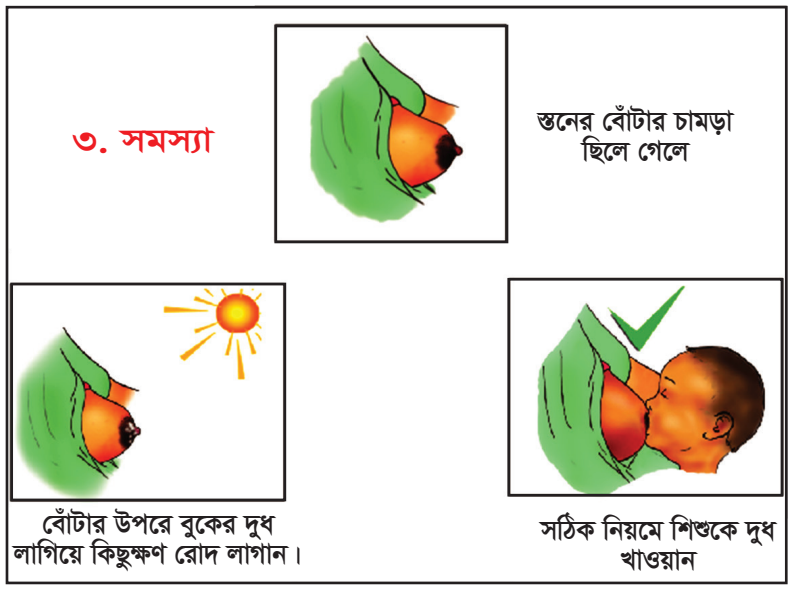

ছবি ৯: স্তনের বোঁটা ফাটা ও তার সমাধান

সমাধান: শিশুকে মায়ের বুকে সঠিকভাবে লাগাতে হবে বা ধরতে হবে। বোঁটা এবং তার চারপাশের কালো অংশসহ শিশুর মুখে দিতে হবে। বোঁটা বেশি ফেটে গেলে দুধ খাওয়ানোর শেষে স্তনের গাঢ় দুধ একটু বের করে ফাটা স্থানে লাগিয়ে রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে কিছু সময় রোদ লাগাতে হবে। সুবিধামতো সময়ে স্তনে একটু খোলা বাতাস লাগাতে হবে। স্তনে সাবান বা ক্রিম লাগানো যাবে না। পরিষ্কার ঢিলাঢালা সুতির কাপড় পরতে হবে। দুধ খাওয়াতে মায়ের যদি অনেক ব্যথা লাগে তাহলে দুধ গেলে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে কখনই শিশুকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা চলবে না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে মা যদি সঠিকভাবে স্তনের বোঁটাসহ কালো অংশ পুরোপুরি মুখে দিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়ান তাহলে এ সমস্যা দেখা দেবে না।

২. স্তন ফোলা

হঠাৎ করে স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে স্তন ফুলে শক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রসবের তৃতীয় দিনে যখন খুব বেশী পরিমাণে দুধ আসে তখন এ সমস্যা দেখা দেয়। এতে স্তনে খুব ব্যথা হয়, এমন কি মায়ের জ্বরও আসতে পারে। স্তন দেখতে লাল ও চকচকে হয়ে যায়। জন্মের পরপরই শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ালে, ঘন ঘন স্তন চুষতে না দিলে বা শিশু টেনে খেতে না পারলে, মায়ের বুকে শিশুর সংস্থাপন সঠিক না হলে এ সমস্যা বেশি দেখা দেয়।

সমাধান: মায়ের স্তন ফুলে শক্ত হয়ে গেলে শিশু ভালোভাবে স্তন ধরতে পারে না বা মুখে নিতে পারে না, ফলে শিশু দুধ খেতে পারে না। তাই আগে বুকের দুধ বের করে স্তন নরম করে শিশুকে চুষতে দিতে হবে। স্তনে যদি খুব বেশি ব্যথা হয় তাহলে প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর আগে গরম পানিতে মোটা কাপড় বা তোয়ালে ভিজিয়ে স্তনের (কালো অংশ বাদ দিয়ে) চারপাশে সেঁক দিতে হবে (ছবি ১০)। সেঁক দেবার পর হাত দিয়ে চেপে দুধ বের করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্তন কিছুটা নরম না হয়। স্তন নরম হলে মা অনায়াসে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, ব্যথা লাগবে না। বের করা দুধ শিশুকে খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই, কারণ এ দুধে শিশুর পেট ভরে গেলে স্তনের দুধ টেনে খেতে চাইবে না। দুধ খাওয়ানো শেষ হলে স্তনে আবার ঠাণ্ডা পানির সেঁক দিতে হবে। ঠাণ্ডা পানির সেঁক দিলে দ্রুত দুধ তৈরি হয়ে স্তন আবার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে না। মা যখনই স্তন ভারী অনুভব করবেন তখনই গরম পানির সেঁক দিয়ে দুধ চেপে বের করে ফেলবেন, এছাড়াও বার বার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন।

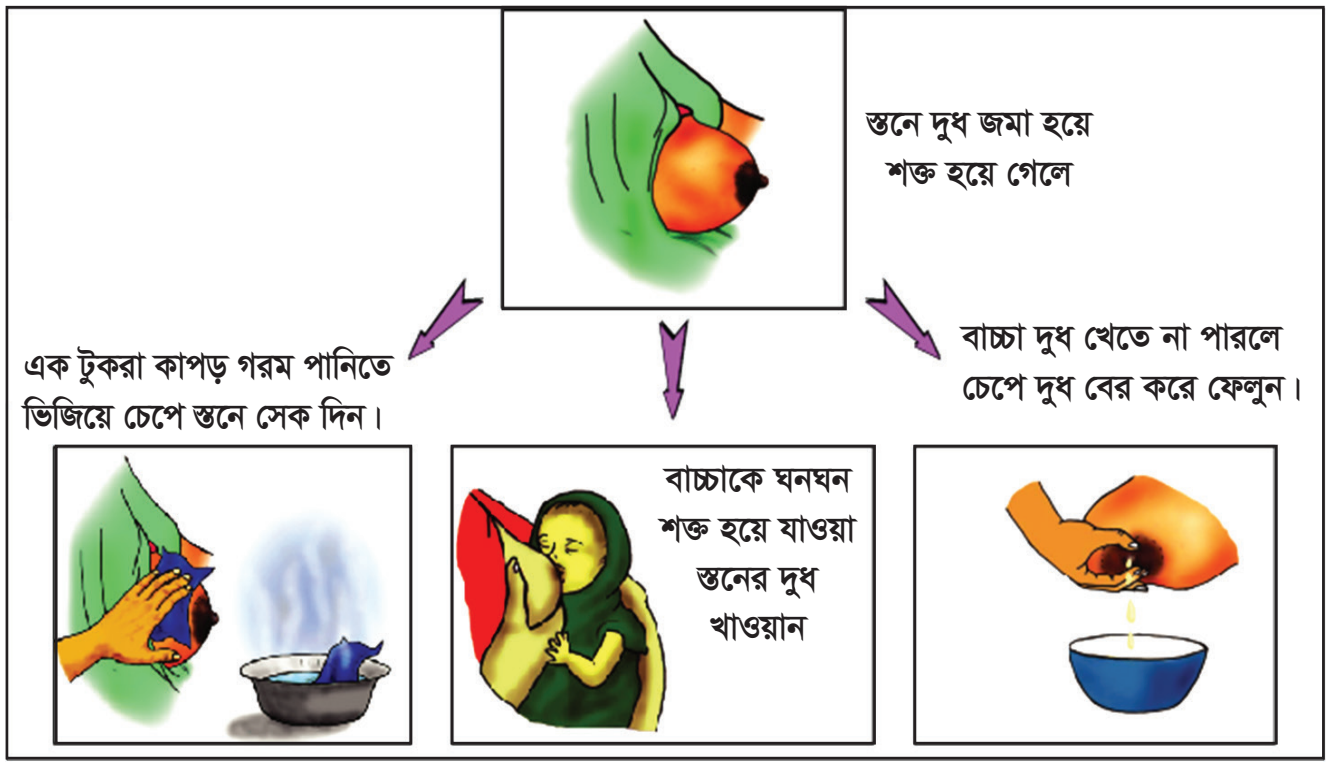

ছবি ১০: স্তন ফোলা ও তার সমাধান

৩. স্তনের বোঁটা ভেতরে ঢুকানো

মায়েদের স্তনের বোঁটা সাধারণতঃ চোখা থাকে যাতে শিশু সহজেই মুখে নিতে পারে। তবে কোন কোন মায়ের স্তনের বোঁটা সমান অথবা ভিতরের দিকে ঢুকানো থাকে (ছবি ১১)। এমতাবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মা শিশুকে ঠিকমতো দুধ খাওয়াতে পারেন না, তবে এজন্য প্রসবের আগে এবং পরে কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে।

ছবি ১১: স্তনের বোঁটা ভিতরের দিকে ঢুকানো

সমাধান :

গর্ভাবস্থা থেকেই গোসলের সময় স্তনের বোঁটা পরিস্কার করতে হবে এবং প্রতিদিন একবার করে বোঁটা হাত দিয়ে টেনে ওঠাতে হবে। এছাড়াও প্রসবের পরপরই হাত দিয়ে টেনে বোঁটা ওঠাতে হবে ও শিশুকে মায়ের বুকের কালো অংশসহ ঘন ঘন চুষতে দিতে হবে। শিশুকে যদি বার বার স্তন চুষতে দেওয়া হয় বা চেষ্টা করে তবে ৩/৪ দিনের মধ্যেই বোঁটা উঠে আসে (ছবি ১২)।

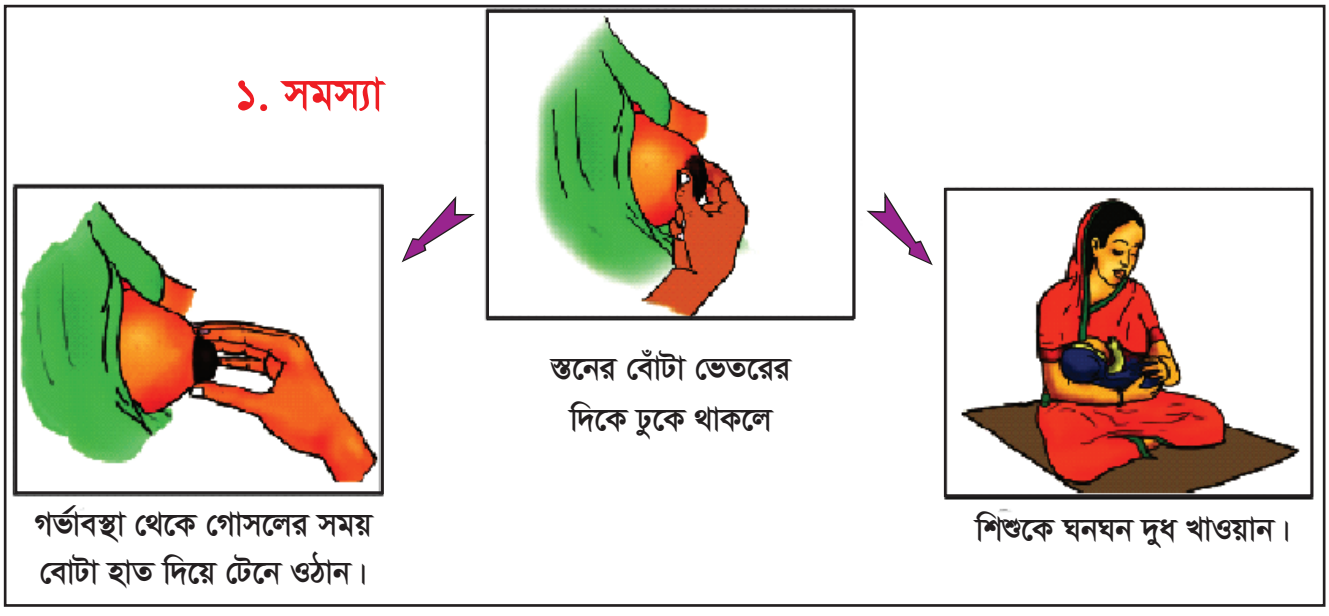

ছবি ১২: বোঁটা হাত দিয়ে টেনে ওঠানো এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানো

৫. ১.৭: পর্যাপ্ত দুধ প্রাপ্তির লক্ষণ

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- মা যাতে শিশুকে কমপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত সফলভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

কার্যক্রম ১: পর্যাপ্ত দুধ প্রাপ্তির লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা

কার্যক্রম ২: মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ তৈরি না হওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করা

কার্যক্রম ৩: মায়ের দুধ বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করা

সময়: ৪০ মিনিট

কার্যক্রম ১: পর্যাপ্ত দুধ প্রাপ্তির লক্ষণ

শিশু যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে মায়ের দুধ পায় তাহলে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়:

১. দিনে ও রাতে ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৬ বার বা তার বেশী প্রসাব করে (এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লক্ষণ)

২. প্রতি মাসে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায়

৩. দুধ খাওয়ার মাঝে শিশু হাসিখুশি থাকে, শান্তভাবে ঘুমায় এবং পরিতৃপ্ত থাকে

৪. দিনে ও রাতে ৮ থেকে ১০ বার বুকের দুধ খায়

কার্যক্রম ২: মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ তৈরি না হওয়ার কারণ

যদি উপরে উল্লেখিত লক্ষণগুলো শিশুর মধ্যে প্রকাশ না পায় তবে বুঝতে হবে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে মায়ের দুধ পাচ্ছে না। পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ না পাওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে; ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতিতে শিশুকে দুধ খাওয়ানো, শিশুর শারিরীক সমস্যার জন্য দুধ টেনে খেতে না পারা এবং মায়ের বুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ তৈরি না হওয়া। শিশু যদি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে এবং সঠিক পদ্ধতিতে দুধ খাওয়ানো হয় তাহলে বুঝতে হবে মায়ের বুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ তৈরি হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণে এটা হতে পারে, যেমন:

১. শিশুকে শালদুধ না খাওয়ানো বা দেরীতে খাওয়ানো

২. বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের বা শিশুর অবস্থান সঠিক না হওয়া বিশেষ করে স্তনের কালো অংশ পুরোপুরি মুখে না দেওয়া

৩. শিশুকে ৬ মাস বয়সের আগেই মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার বা পানীয় দেওয়া, এতে করে শিশু বুকের দুধ কম খাবে, ফলে মায়ের বুকে দুধ কম তৈরি হবে।

৪. শিশুর চাহিদা অনুযায়ী বুকের দুধ না খাওয়ানো অথবা অনেকক্ষণ পর পর বুকের দুধ খাওয়ানো

৫. যতক্ষণ শিশু খেতে চায় ততক্ষণ খেতে না দেওয়া বা অল্প সময় নিয়ে খাওয়ানো

৬. রাতে দেরী করে দুধ খাওয়ানো

৭. কর্মজীবি মায়েদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিরতি দিয়ে (৩ ঘন্টা বা তার বেশী) বুকের দুধ চেপে বের করা

কার্যক্রম ৩: মায়ের বুকের দুধ বাড়ানোর উপায়

নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে মায়ের বুকে দুধের উৎপাদন বাড়ানো যায়:

১. দুধ খাওয়ানোর সময় মা ও শিশুর সঠিক অবস্থান ও মায়ের বুকে শিশুর সঠিক সংস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। মাকে হাতে ধরে দেখিয়ে দিতে হবে এবং কাজটি সঠিকভাবে করতে সাহায্য করতে হবে।

২. ৬ মাস বয়সের মধ্যে শিশু যখনই দুধ খেতে চাইবে তখনই খেতে দিতে হবে। সময় নিয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশু যত বেশি দুধ খাবে তত বেশি মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা করতে হবে। দিনে ও রাতে শিশুকে কমপক্ষে ৮-১০ বার বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

৩. এক স্তন থেকে পরিপূর্ণভাবে দুধ খাওয়ানোর পর আরেক স্তনের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। মনে রাখতে হবে, একবারে শুধু এক স্তনের দুধই খাবে।

৪. রাতের বেলায় শিশুকে বারে বারে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, তাহলে পরের দিন প্রচুর দুধ তৈরি হবে।

৫. মাকে প্রতিবেলায় খাবার বেশী করে খেতে হবে। দিনে অন্ততঃ দুইবার প্রাণীজ আমিষ (মাছ/মাংস/কলিজা/ডিম) খেতে হবে, এছাড়া ফলও খেতে হবে। দিনে ৮-১০ গ্লাস পানি খেতে হবে। বিশ্রাম নিতে হবে।

৬. মায়ের নিজের উপরে আস্থা রাখতে হবে।

৫. ১.৮: বাড়তি খাবার কি এবং পারিবারিক বাড়তি খাবারের গুরুত্ব

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাড়তি খাবার কাকে বলে তা জানতে পারবেন।
- পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানোর উপকারিতা ও না খাওয়ানোর অপকারিতা কি তা জানবেন।
- কেন একটি শিশুকে ৬ মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পর থেকে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে তা বলতে পারবেন।

মোট সময়: ৩০ মিনিট

কার্যক্রম ১: বাড়তি খাবার কি এবং শিশুকে ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর বা ৭ মাস বয়স থেকে (১৮১ দিন) মায়ের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব নিয়ে অলোচনা।

কার্যক্রম ২: পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানোর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ৩: পারিবারিক বাড়তি খাবার না খাওয়ানোর অপকারিতা নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ১: বাড়তি খাবার কি এবং শিশুকে ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর বা ৭ মাস বয়স থেকে (১৮১ দিন) মায়ের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন বাড়তি খাবার বলতে তারা কি বোঝেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত জেনে সহায়ক আরও ভালোভাবে বাড়তি খাবার সম্বন্ধে বলবেন।
- সহায়ক পরে পারিবারিক বাড়তি খাবার খাওয়ানোর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলবেন।

১. শিশুর ৬ মাস বয়স পূর্ণ হবার পর মায়ের দুধের পাশাপাশি যে খাবার খাওয়ানো হয় তাকেই বাড়তি খাবার বলে। শিশুর ৬ মাস বয়স পূর্ণ হয়ে যাবার পর থেকে তার সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে, বাড়তি খাবারের পাশাপাশি শিশুকে অবশ্যই কমপক্ষে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।

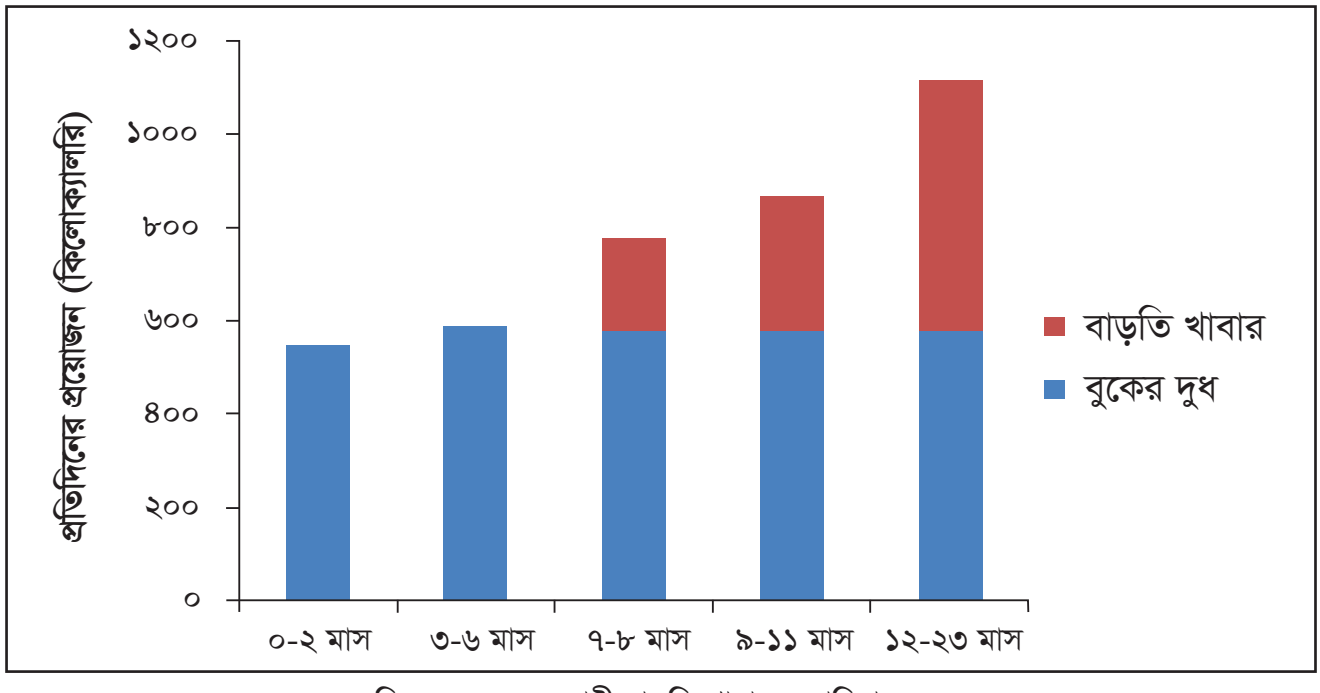

ছবি ১৩: বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের চাহিদা

২. উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির বেশিরভাগই আসে বুকের দুধ থেকে। তাই ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া উচিত। ৭-৮ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধ থেকে পাওয়া শক্তি ছাড়াও দিনে শিশুর আরও ২০০ কিলোক্যালরি, ৯-১১ মাস বয়সে ৩০০ কিলোক্যালরি, এবং ১২-২৩ মাস বয়সে ৫৫০ কিলোক্যালরি, শক্তির প্রয়োজন। এ বাড়তি শক্তি শিশু ৭ মাস বয়স থেকে শুরু করা বাড়তি খাবার থেকে পেয়ে থাকে।

৩. পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য যে খাবার রান্না করা হয় তাকে পারিবারিক খাবার বলে। এ পারিবারিক খাবার ভালভাবে চটকিয়ে নরম, ঘন ও পুষ্টিকর করে শিশুকে খেতে দেওয়া হলে তাকে পারিবারিক বাড়তি খাবার বলে। অর্থাৎ মায়ের দুধের পাশাপশি যখন শিশুর বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় তখন তাকে পারিবারিক খাবারে অভ্যস্ত করতে হয়।

তার জন্য আলাদাভাবে কোন কিছু রান্না করার প্রয়োজন নেই। এতে মায়ের যেমন সুবিধা হয় তেমনি শিশু ঘরে তৈরী পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে। পারিবারিক খাবার যা শিশু খেতে পারে সেগুলো হলো ভাত, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা, ডাল, ইত্যাদি।

৪. ৬ মাস বয়স পূর্ণ হলে শিশু বাড়তি খাবার সহজে খেতে ও গিলতে শিখে, পাশাপাশি হজমও করতে পারে। এ সময় শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস না করলে পরবর্তীতে সে ঘন, শক্ত ও বিভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে শিখবে না এবং বিভিন্ন ধরণের খাবারের অভাবে অপুষ্টির শিকার হবে।

নোটঃ মনে রাখতে হবে, ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে শিশুকে বাড়তি খাবার দেয়া শুরু করলে শিশু মায়ের দুধ খাওয়া কমিয়ে দেবে, ফলে শিশুর শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হবে।

কার্যক্রম ২: শিশুর পারিবারিক খাবারের উপকারিতা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে শিশুকে পারিবারিক খাবার খাওয়ানোর উপকারিতা কি তা জানতে চাইবেন এবং পরে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

শিশুর পারিবারিক খাবারের উপকারিতা

১. শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হবার পর মায়ের দুধের পাশাপশি শিশুকে ঘরে তৈরী পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়, এতে শিশুর শারিরীক বৃদ্ধি ও মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি শক্তির চাহিদা পূরণ হয়।

২. পারিবারিক খাবারে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপাদান থাকে, আর বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপাদান থেকে অনেক বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়। শিশু শরীরে যত বেশি পুষ্টি উপাদান পায় তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তত বাড়ে, অর্থাৎ অসুখ-বিসুখ কম হয়।

কার্যক্রম ৩: শিশুকে পারিবারিক খাবার না খাওয়ানোর অপকারিতা

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন সঠিক সময়ে বাড়তি খাবার শুরু না করলে শিশুর কি কি ক্ষতি হতে পারে। সবার মতামত জেনে তিনি সঠিক তথ্য জানাবেন।

শিশুকে পারিবারিক খাবার না খাওয়ানোর অপকারিতা

১. শিশুকে যদি বয়স অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া না হয় তবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঠিকমতো হয় না। শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে বা বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক না হলে ভবিষ্যতে সে কর্মক্ষম হতে পারবে না। ফলে সে পরিবারের কোন উপকার করতে পারবে না, উল্টো পরিবারের বোঝা হয়ে যাবে।

২. শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা যদি পূরণ না হয় তবে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হবে। এতে করে পরিবারে চিকিৎসা ও ঔষধের খরচ বেড়ে যায়।

৩. প্রয়োজনীয় আয়রন বা লৌহের ঘাটতির জন্য শিশুর রক্তস্বল্পতা হতে পারে। রক্তস্বল্পতা হলে শিশুর খাবারের প্রতি রুচি চলে যায়, ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে ও আরও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। এ প্রয়োজনীয় আয়রন শিশু পেয়ে থাকে মায়ের দুধ ও পারিবারিক বাড়তি খাবার থেকে।

৪. শিশুকালে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হলে সারাজীবনই এর প্রভাব থেকে যায়। মেয়ে শিশু হলে পরবর্তীতে সে যখন মা হবে তখন তার মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সে অপুষ্ট শিশুরও জন্ম দেয়।

৫. ১.৯: শিশুর পারিবারিক খাবারের ৭টি মূল বৈশিষ্ট্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুর পারিবারিক খাবারের সাতটি (৭টি) মূল বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানবেন ও বলতে পারবেন।

মোট সময়ঃ ১ ঘন্টা

শিশুর পারিবারিক খাবারের ৭টি মূল বৈশিষ্ট্যঃ

১. খাবারের পরিমাণ
২. বার/দিনে কতবার
৩. খাবারের ঘনত্ব
৪. খাদ্যের উপাদান
৫. ইশারা বুঝে খাওয়ানো
৬. সাবান দিয়ে হাত ধোয়া
৭. অসুস্থ শিশুকে খাওয়ানো

কার্যক্রম ১: ৭ মাস বয়স থেকে ২৪ মাস বয়সী শিশুদের কোন বয়সে কি পরিমাণ ও কতবার বাড়তি খাবার খেতে দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ২: খাবারের ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ৩: বিভিন্ন ধরণের খাদ্য নির্বাচন নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ৪: শিশুর ইশারা বুঝে খাওয়ানো নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ৫: খাবার তৈরীর আগে এবং শিশুকে খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ৬: অসুস্থ শিশুকে খাওয়ানো নিয়ে আলোচনা।

কার্যক্রম ১: পূর্ণ ৬ মাস বা ৭ মাস বয়স থেকে ২৪ মাস বয়সী শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রতিদিন কি পরিমাণ খাবার কতবার খেতে দেওয়া উচিত

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হবার পর অর্থাৎ ৭ মাস থেকে ২৪ মাস বয়স বিভিন্ন সময়ে শিশুকে প্রতিদিন কি পরিমান খাবার কতবার খাওয়াতে হবে তা জানতে পারবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন ধরণের খাবার থেকে প্রয়োজনীয় খাবার নির্বাচন করতে পারবেন।
- বাটিতে মেপে শিশুর জন্য খাবার তৈরী করতে পারবেন এবং মাকে শেখাতে পারবেন।

শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পারিবারিক খাবারের পরিমান ও বার

- সহায়ক ২৫০ মি:লি: মাপের ১টি বাটি দিয়ে খাবার মাপা শেখাবেন।
- মি:লি: মাপের বাটি দিয়ে বিভিন্ন মাপের বাটিতে দাগ দেওয়া শিখিয়ে দেবেন।

নিম্নের ছক ও ছবির মাধ্যমে শিশুর বয়স অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ ও বার দেখানো হলো:

*** শিশুর ২৩ মাস বয়স পর্যন্ত এভাবেই খাবারের পরিমাণ ও বার অনুসরণ করতে হবে**

বয়স	পরিমাণ	বার	দিনের মোট খাবার
৬-৮ মাস বয়স (পূর্ণ)	২৫০ মি: লি: (১ পোয়া) বাটির আধা (১/২) বাটি	২ বার + ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা	মায়ের বুকের দুধ (শিশু যতবার চাইবে) + পারিবারিক খাবার (প্রাণীজ খাবার যেমন: ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ) + শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন: চাল, গম, আলু ইত্যাদি + বিভিন্ন ধরণের ডাল জাতীয় খাবার ও বাদাম যেমন: মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সবজি ও ফল + অন্যান্য শাকসব্জি ও ফল
৯-১১ মাস বয়স (পূর্ণ)	২৫০ মি: লি: (১ পোয়া) বাটির আধা (১/২) বাটি	৩ বার + ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা	পারিবারিক খাবার (প্রাণীজ খাবার যেমন: ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ) + শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন: চাল, গম, আলু ইত্যাদি + বিভিন্ন ধরণের ডাল জাতীয় খাবার ও বাদাম যেমন: মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সবজি ও ফল + অন্যান্য শাকসব্জি ও ফল এবং ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা
১২-২৩ মাস বয়স (পূর্ণ)	২৫০ মি: লি: (১ পোয়া) বাটির এক (১) বাটি	৩ বার + ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা	পারিবারিক খাবার (প্রাণীজ খাবার যেমন: ডিম, মুরগি, মাংস, কলিজা, মাছ, শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন: চাল, গম, আলু ইত্যাদি) + বিভিন্ন ধরণের ডাল জাতীয় খাবার ও বাদাম যেমন: মসুরের ডাল, মুগের ডাল, সিমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি + রঙিন শাক-সব্জি ও ফল + অন্যান্য শাকসব্জি ও ফল) এবং ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা

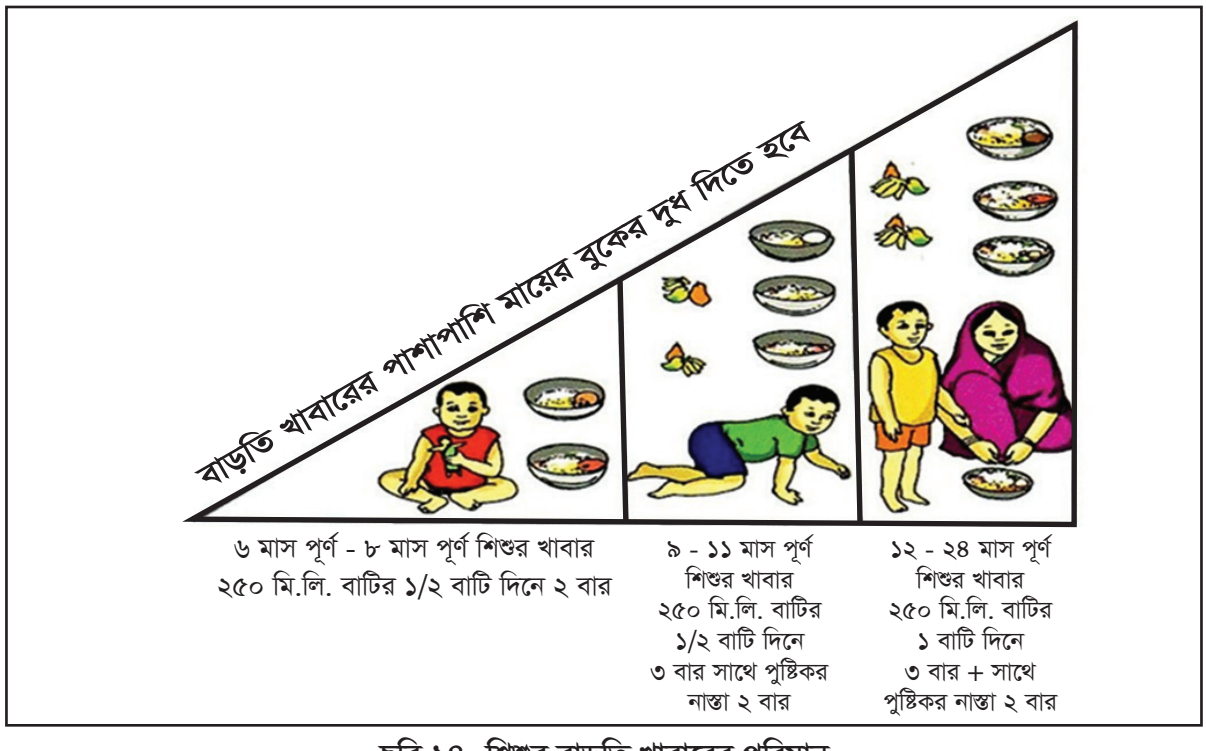

ছবি ১৪: শিশুর বাড়তি খাবারের পরিমান

শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কিছু কুসংস্কার/ভুল ধারণা:

- শিশুর অসুখ হলে তার খাওয়া বন্ধ করে দেয়া
- শিশুর ডায়রিয়া হলে মায়ের দুধ খাচ্ছে এমন শিশুর মা শাক-সব্জি খাওয়া বন্ধ করে দেয়া
- ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে না দেয়া
- দামী খাবারে পুষ্টি বেশী
- ৬ মাসের আগে শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়ানো ভাল
- বাড়তি খাবারে শিশুর ডায়রিয়া/পাতলা পায়খানা হয়

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বিভিন্ন বয়সে শিশুর বাড়তি খাবারের ঘনত্ব কেমন হবে তা জানতে পারবেন।
- খাবারের ঘনত্ব কিভাবে ঠিক রাখতে হবে তা শিখবেন এবং মাকে শেখাতে পারবেন।

কার্যক্রম ২: পারিবারিক খাবারের ঘনত্ব

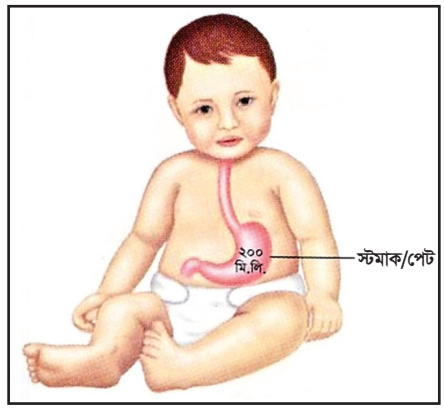

১. খাবারের ঘনত্ব ঠিক হলে শিশুর খাবারটি পুষ্টিকর হবে। শিশু খাবার গিলতে, চিবাতে ও বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বুঝতে শিখবে।

২. শিশুর খাবার যেন বেশী তরল বা পাতলা না হয়। খাবার যত বেশী তরল বা পাতলা হবে, খাবারের পুষ্টিমান তত কমে যাবে। মনে রাখতে হবে, শিশুর পেট খুব ছোট, তাই পাতলা খাবার দিলে অল্পতেই তার পেট ভরে যাবে এবং কম পরিমাণে খাবার খেতে পারবে (ছবি ১৪)।

৩. শিশুর খাবার তৈরি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে ভাতের পরিমাণ যেন কম হয়, তা না হলে শুধু ভাতে শিশুর পেট ভরে যাবে, বিভিন্ন ধরণের খাবার খেতে পারবে না।

৪. শিশুকে ঘন ডাল দিতে হবে। ডালের উপরের পানি দেওয়া যাবে না, এমনকি তরকারির ঝোলও না, এতে খাবার পাতলা হয়ে পুষ্টিমাণ কমে যাবে।

৫. দিনে একবার হলেও মাছ অথবা মাংস অথবা মুরগির কলিজা অথবা ডিম অর্থাৎ যেকোন এক ধরণের প্রাণীজ আমিষ ভাতের সাথে দিতে হবে।

৬. মাখানো খাবারটি এমন হবে যেন তা চামচ/হাত দিয়ে তুললে সহজে পড়ে না যায় (ছবি ১৫)।

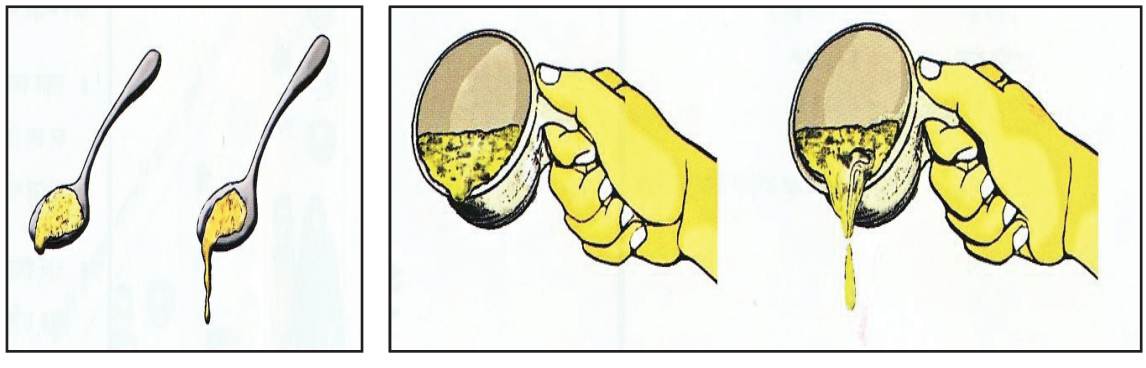

ছবি ১৫: খাবারের ঘনত্ব

৭. শিশুরা ৮-৯ মাস বয়স থেকে নিজে নিজে হাত দিয়ে ধরে খাবার মুখে দিতে পারে, এই কারণে এই বয়সে নাস্তা হিসাবে ছোট ছোট টুকরা খাবার, যেমন মিষ্টি কুমড়া ভাজি/কলা ভাজি/মুরগির কলিজা/ডিম (শিশু যেভাবে খেতে পছন্দ করে), এছাড়াও যেকোন মৌসুমী ফলের ছোট ছোট টুকরা, যেমন পাকা আম, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁঠাল, ইত্যাদি দিলে সে নিজে নিজে হাত দিয়ে তুলে খেতে পারবে।

কার্যক্রম ৩: বিভিন্ন ধরণের খাদ্য নির্বাচন

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ৭-২৪ মাস বয়সী শিশুদের কি কি ধরণের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে তা জানতে ও বলতে পারবেন।
- কেন এসব খাবার দিতে হবে তা বুঝতে পারবেন।

শিশুর খাবার তৈরির ক্ষেত্রে পরিবারের জন্য রান্না করা খাবার থেকে পুষ্টিকর খাবার নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে, দিনে কমপক্ষে একবার হলেও যেন প্রাণীজ খাবার, যেমন মাছ অথবা মাংস অথবা মুরগির কলিজা অথবা ডিম থাকে। বাকী সময় প্রাণীজ আমিষ না থাকলে ডাল বা ডাল জাতীয় (উদ্ভিজ আমিষ) খাবার থাকা উচিত। ছোট মাছ বা মাংস পাটায় পিশে ভাতের সাথে মেখে খাওয়ানো যায়। দই, দুধের তৈরী পায়েস নাস্তা হিসাবে থাকা উচিত। এছাড়া মিষ্টি কুমড়া ভাজি, কলা ভাজি, পাকা আম, পাকা পেপে, কাঁঠাল, টক জাতীয় ফল ইত্যাদি খাবারও শিশুকে দিতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর সময় আলাদাভাবে পানি খাওয়ানোর দরকার নেই এতে তার ছোট পেট ভরে যাবে এবং তার জন্য তৈরি করা পুরোটা খাবার খেতে পারবে না। শিশুকে পানির পরিবর্তে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, এতে শিশু আরও বেশী পুষ্টি পাবে। মনে রাখতে হবে, শিশুর মুখেও স্বাদ আছে, শিশুরা বিভিন্ন ধরণের খাবার খেতে ভালোবাসে, তাই তার খাবারে নতুন নতুন উপকরণ যোগ করতে হবে।

খাবার তৈরির পদ্ধতি

প্রথমে ২৫০ মি:লি: মাপের একটি বাটি নিতে হবে। বাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রাণীজ আমিষ, ঘন ডাল এবং সবজি নিয়ে বাকিটুকু ভাত দিয়ে পূরণ করতে হবে। আগেই ভাত নেয়া যাবে না, তাহলে ভাতের পরিমাণ বেশি হয়ে যেতে পারে। সবকিছু নেওয়ার পর একসাথে মাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, মোট তৈরি করা খাবারের পরিমান যাতে বয়স অনুযায়ী ১/২ বাটি বা ১ বাটি হয় (ছবি ১৬)।

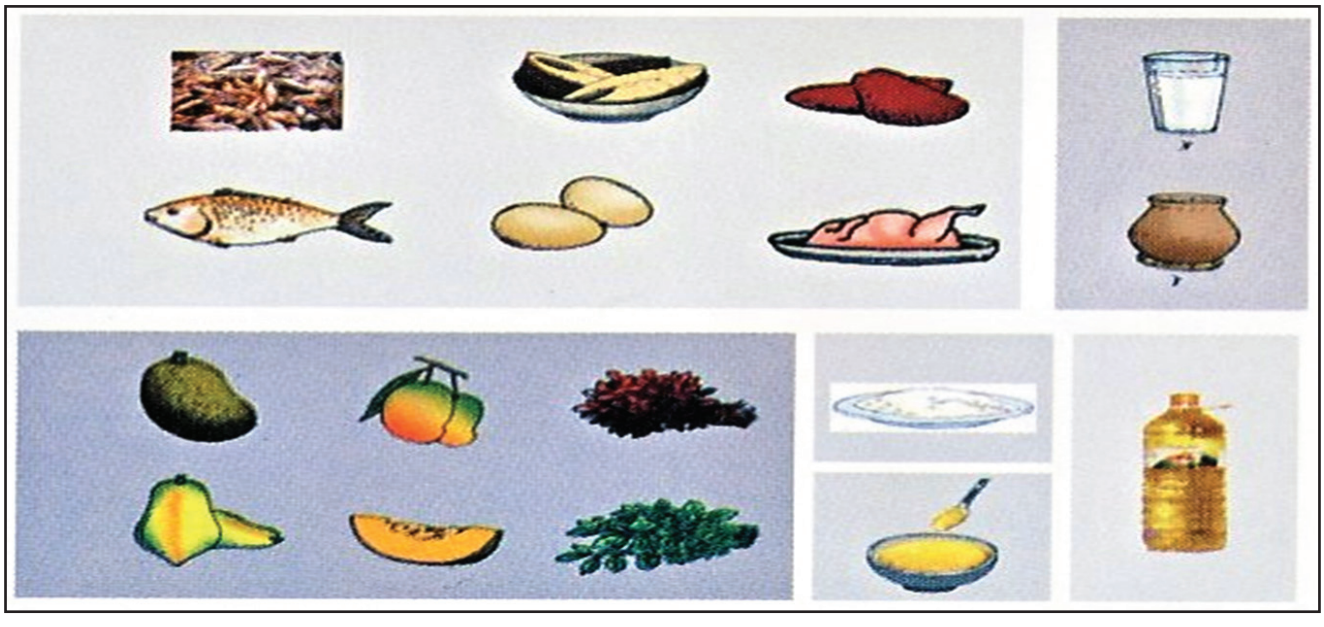

ছবি ১৬: নির্বাচিত খাবার

কার্যক্রম ৪: শিশুর ইশারা বুঝে খাওয়ানো

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন শিশুর ইশারা বুঝে খাওয়ানো বলতে তারা কি বোঝেন। সবার মতামত নিয়ে সহায়ক উদাহরণ সহকারে ইশারা বুঝে খাওয়ানো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

১. শিশুকে উৎসাহ দিয়ে খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর খাওয়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে এবং সে খেতে শিখবে।

২. শিশুকে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্য্য নিয়ে খাওয়াতে হবে। কখনই জোর করে খাওয়ানো যাবে না।

৩. শিশুকে তার পছন্দের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

৪. গল্প বলে, শিশুর চোখে চোখ রেখে খাওয়াতে হবে এবং শিশুর সামনা সামনি বসে মা শিশুকে খাওয়াবেন। খাওয়ার সময় মা ও শিশুর মধ্যে যে যোগাযোগ হয় তা শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে শিশু অনেক কিছু শেখে, সে বিভিন্ন ধরণের খাবার চিনতে শিখে, খাবারের স্বাদের সাথে পরিচিত হয়।

ছবি ১৭: শিশুর ইশারা বুঝে খাওয়ানো

৫. শিশুকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে শিশু যদি ক্লান্ত থাকে বা তার যদি ঘুম পায় তাহলে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত না (ছবি ১৭)।

কার্যক্রম ৫: খাবার তৈরীর আগে এবং খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, কেন খাবার তৈরীর আগে মা অথবা অন্য পরিচর্যাকারীর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- সহায়ক আরও জিজ্ঞাসা করবেন, কেন শিশুকে খাওয়ানোর আগে মা ও শিশুর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
- সবার মতামত জেনে সহায়ক প্রকৃত কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করবেন।

শিশুর খাবার তৈরি করার আগে অবশ্যই মা/পরিচর্যাকারীকে সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর আগে আর একবার নিজের হাত এবং সাথে শিশুর হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। সব মানুষের হাতেই ময়লা ও বিভিন্ন ধরণের রোগজীবাণু থাকে। মায়ের ও শিশুর হাতের রোগজীবাণু শিশুর খাবারে গেলে এবং সেখান থেকে পেটে গেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি, টাইফয়েড, জন্ডিস, ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ হয়। খাবার তৈরির আগে এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুলে হাতে লেগে থাকা ময়লা ও রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। হাত ধোয়ার জন্য এমন জায়গায় সাবান রাখতে হবে যাতে প্রতিবার শিশুর খাবার তৈরী ও খাওয়াবার সময় সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা মায়ের মনে থাকে।

ছবি ১৮: সাবান দিয়ে হাত ধোয়া

কার্যক্রম ৬: অসুস্থ শিশুকে খাওয়ানো

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- শিশু অসুস্থ থাকলে তাকে কিভাবে খাওয়াতে হয় জানতে পারবেন।
- শিশুর ইশারা বুঝে, উৎসাহ দিয়ে খাওয়ানো কি এবং কিভাবে মাকে তা শেখানো যায় তা বলতে পারবেন।

শিশু অসুস্থ হলে তাকে বেশী করে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। অসুস্থ শিশুর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ খাবার হচ্ছে মায়ের দুধ। মায়ের দুধ খেলে শিশু সহজে দুর্বল হয়ে পড়বে না এবং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। জ্বরের কারণে বা ডায়রিয়ার কারণে শিশুর পিপাসা বেশী হয়। ঘন ঘন মায়ের দুধ খাওয়ালে তার পিপাসা মিটে যাবে। মায়ের দুধের পাশাপাশি অসুস্থ শিশুকে তার পছন্দের পুষ্টিকর নরম খাবার দিতে হবে। অসুস্থতার কারণে শিশু একসাথে বেশী পরিমাণে না খেতে পারে, সেক্ষেত্রে বার বার অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে।

শিশুর অসুখ ভালো হয়ে গেলে তার ক্ষুধা বাড়বে এবং মুখের রুচি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে, ফলে এসময় তার খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে এবং নানা ধরণের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসুখের কারণে তার যে ওজন কমে গিয়েছিল তা যেন আবার ফিরে আসে। অসুখের সময়ের ঘাটতি পূরণ না হলে শিশু আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

নোট: ৭-১১ মাসের মধ্যে শিশুকে নীল রঙের ১টা ভিটামিন এ ক্যাপসুল (১০০,০০০ আইইউ) খাওয়াতে হবে। ১-২ বৎসর বয়সের শিশুদের বছরে ২ বার লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ১টি করে (২০০,০০০ আইইউ) খাওয়াতে হবে। এতে করে শিশু অন্ধত্ব, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও মারাত্মক অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে এবং শিশু মৃত্যু কমে যাবে।

৬ মাসের পর থেকে শিশুকে পারিবারিক খাবারের সাথে নিয়মিত পুষ্টিকণা খাওয়াতে হবে। এতে করে শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগবে না।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে শিশুর বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের বৈশিষ্ট্যের ৪টি অংশ দেখানো হয়েছে:

বয়স	খাদ্য নির্বাচন	শিশুর ইশারা বুঝে খাওয়ানো	হাত ধোয়া	অসুস্থ শিশুকে খাওয়ানো
• ৭-৮ মাস • ৯-১১ মাস • ১২-২৪ মাস	১. প্রাণীজ আমিষ ২. উদ্ভিজ আমিষ ৩. শাক-সবজি ৪. ভাত ৫. তেল *নতুন নতুন খাবার যোগ করতে হবে *পাশাপাশি মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে	১. শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে ২. সময় ও ধৈর্য্য নিয়ে খাওয়াতে হবে ৩. শিশুর পছন্দের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে ৪. শিশুর চোখে চোখ রেখে, গল্প বলে ও সামনা সামনি বসে খাওয়াতে হবে ৫. নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট জায়গায় খাওয়াতে হবে ৬. শিশুর ক্ষুধা না থাকলে বা খেতে না চাইলে জোর করা যাবে না ৭. শিশু ক্লান্ত বা ঘুমঘুম থাকলে খাওয়ানো যাবে না	১. খাবার তৈরীর আগে মা/পরিচর্যাকারীর হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে ২. শিশুকে খাওয়ানোর আগে মা/পরিচর্যা কারী এবং শিশু উভয়ের হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে	১. বুকের দুধের উপরে জোর দিতে হবে ২. পছন্দের পুষ্টিকর এবং নরম খাবার দিতে হবে ৩. বারে বারে অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে ৪. অসুখ ভালো হয়ে গেলে স্বাভাবিক খাবার থেকে একটু বেশী খাবার খাওয়াতে হবে

৫. ১.১০: বয়স অনুযায়ী শিশুর খাবার নির্বাচন ও খাবারের ঘনত্ব

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পারিবারিক খাবার শিশুর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা জানবেন।
- ৭ (১৮১ দিন) থেকে ২৪ মাস বয়সের শিশুদের জন্য কোন কোন খাবার সবচেয়ে ভালো তা বুঝতে ও বলতে পারবেন।
- শিশুর খাবারের ঘনত্ব কেমন হওয়া উচিত তা বুঝতে ও বলতে পারবেন।
- শিশুর জন্য বয়স অনুযায়ী খাবারের ধরণ, পরিমাণ ও ঘনত্ব বিবেচনা করে ১ বেলার খাবার তৈরী করা হাতে কলমে শিখবেন এবং পরে তা মায়েদেরকেও শেখাতে পারবেন।
- খাওয়ানোর আগে মায়ের এবং শিশুর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবেন।

কার্যক্রম ১: ৭ (১৮১ দিন) থেকে ২৪ মাস বয়সী শিশুদের জন্য পারিবারিক পুষ্টিকর খাবার নির্বাচন ও খাবারের ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

কার্যক্রম ২: সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন না করলে শিশুর কি কি সমস্যা হতে পারে তা জানানো।

কার্যক্রম ৩: শিশুর খাবার তৈরি করার আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ও বাটি ধুয়ে নেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

কার্যক্রম ৪: ৭ (১৮১ দিন) থেকে ২৪ মাস বয়সের শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার বেছে নেয়া নিয়ে আলোচনা করা।

মোট সময়ঃ ১ ঘণ্টা

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১. ২৫০ মি:লি: মাপের ৩টি বাটি
২. বিভিন্ন সাইজের ছোট, বড় বাটি এবং চামচ
৩. তেলের বোতল ও সাবান
৪. কার্ড ও মার্কার
৫. রান্না করা সব্জি, যেমন বরবটি, মিষ্টি কুমড়া, শাক, ডিম, মাছ, মাংস, ডাল, ভাত এবং মৌসুমী ফল যেমন পাকা পেঁপে, কলা, আম, ইত্যাদি।

কার্যক্রম ১: ৭ (১৮১ দিন) থেকে ২৪ মাস বয়সী শিশুদের জন্য পারিবারিক পুষ্টিকর খাবার নির্বাচন ও খাবারের ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা ও হাতে কলমে শেখানো

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে পুষ্টিকর খাবারের উপাদান নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর এসব খাদ্য উপাদানের মধ্য থেকে বিভিন্ন খাবারের সমন্বয়ে কিভাবে শিশুর একটি পুষ্টিকর খাবার তৈরী করা যায় তা ব্যাখ্যা করবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক ক্লাশ রুমে বিভিন্ন খাবার এনে বা ছবি দেখিয়ে হাতে কলমে বিষয়টি শেখাতে পারবেন।
- খাবার কতটা ঘন হবে তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন।
- খাবার কিভাবে চটকাতে হবে এবং কতটুকু চটকাতে হবে যাতে করে শিশু খাবারটি গিলতে পারে সে ব্যাপারেও আলোচনা করবেন।
- সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন না করলে কি কি সমস্যা হতে পারে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে তা জানতে চাইবেন এবং শিশুর জন্য প্রাণীজ খাবারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলবেন।

কার্যক্রম ২: সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন না করলে শিশুর কি কি সমস্যা হতে পারে

১. শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য যে পুষ্টি দরকার তা সে পাবে না।
২. খাবার শক্ত থাকলে শিশুর চিবাতে বা গিলতে অসুবিধা হবে ও হজমে অসুবিধা হবে।
৩. শিশুর খাবার বেশী তরল থাকলে অল্পতেই পেট ভরে যাবে এবং সঠিক পুষ্টি পাবে না, এছাড়াও নিজে খাবার ধরে বা উঠিয়ে খেতে শিখবে না।

কার্যক্রম ৩: শিশুর খাবার তৈরি করার আগে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ও বাটি ধুয়ে নেওয়ার গুরুত্ব

মায়ের হাত ধোয়ার সময় এবং গুরুত্ব:

মা প্রতিবার খাবার তৈরীর আগে এবং শিশুকে খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। দৈনন্দিন কাজ করার ফলে হাতে যেসব ময়লা ও জীবানু লেগে থাকে তা দূর হয়ে যাবে। হাত না ধুলে খাবারে এবং শিশুর দেহে ঐ জীবানু ঢুকে সংক্রমন ঘটাবে, যেমন-ডায়রিয়া, আমাশয়, ইত্যাদি।

শিশুর হাত ধোয়ার সময় এবং গুরুত্বঃ

শিশুকে হাত দিয়ে ধরে খাবার খেতে উৎসাহিত করা হয়। প্রতিবার খাওয়ানোর আগে মা শিশুর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবেন। শিশু বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করে, ফলে হাতে ময়লা ও জীবানু লেগে থাকে। হাত না ধুয়ে খাবার ধরলে শিশুর দেহে ঐ জীবানু ঢুকে সংক্রমন ঘটাবে, যেমন-ডায়রিয়া, আমাশয়, ইত্যাদি।

কার্যক্রম ৪: ৭ (১৮১ দিন) থেকে ২৪ মাস বয়সের শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের সমন্বয়ে একবেলার খাবার ও নাস্তা তৈরী

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলকে একটি টেবিলের সামনে যেতে বলবেন। টেবিলের উপর বিভিন্ন ধরণের সবজি, বিভিন্ন সাইজের বাটি, "হাত ধোয়া" লেখা কার্ড থাকবে।
- সহায়ক প্রতিটি দলকে টেবিলে রাখা খাবার থেকে ৭-২৪ মাস বয়সের শিশুর একবেলার খাবার ও নাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করতে বলবেন।
- ২০ মিনিট পর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তাদের তৈরী খাবারের পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সহায়ক প্রত্যেক দলের কাজের উপরে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানতে চাইবেন।
- প্রতিটি দলের কাছে খাবারের পরিমাণ, খাবারের ঘনত্ব, কতবেলা খাবে এবং বয়স অনুযায়ী খাবার কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানোর জন্য মায়েরা কি কি করতে পারেন তা আবার আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের তা মনে করিয়ে দেবেন।

৫. ১.১১: শিশুকে পারিবারিক খাবার খাওয়ানোর ভিডিও দেখানো এবং ভিডিও নিয়ে আলোচনা

কার্যক্রম ১: ভিডিওর উদ্দেশ্য বর্ণনা ও ভিডিও প্রদর্শন

কার্যক্রম ২: ভিডিও বিষয়ক আলোচনা

মোট সময়: ৩০ মিনিট (প্রয়োজনে ২ বার ভিডিওটি দেখাবেন)

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টিভি, ভিডিও প্লেয়ার ও ভিডিও ক্যাসেট।

কার্যক্রম ১: ভিডিওর উদ্দেশ্য বর্ণনা ও ভিডিও প্রদর্শন

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, প্রশিক্ষণে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা এখন ভিডিওতে দেখানো হবে, চোখে দেখলে বিষয়গুলো মনে রাখতে সুবিধা হবে। কানে শোনা, চোখে দেখা এবং হাতে কলমে করা, এই তিনটি পদ্ধতি মিলিয়ে এই প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো পরবর্তীতে তাদের কাজে অনেক সাহায্য করবে।
- অংশগ্রহণকারীদের পারিবারিক খাবারের পরিমাণ, খাবারের ঘনত্ব, খাদ্য নির্বাচন, শিশুর ইশারা বুঝে উৎসাহ দিয়ে খাওয়ানো, মায়ের ও শিশুর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং ২ বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন।
- শিশু যদি খেতে না চায় তাহলে মা কিভাবে তার শিশুকে খাওয়াতে পারবেন তার কৌশলগুলো লক্ষ্য করতে বলবেন।
- একজন স্বাস্থ্যকর্মী কিভাবে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে মাকে পরামর্শ দেন তা ভালোভাবে খেয়াল করতে বলবেন।

কার্যক্রম ২: ভিডিও বিষয়ক আলোচনা

- সহায়ক ভিডিও নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবারের পরিমাণ, খাবারের ঘনত্ব, খাদ্য নির্বাচন, হাত ধোয়া, ইশারা বুঝে খাওয়ানো, এসব বিষয়ে জানতে চাইবেন।
- খানা পরিদর্শনের সময় শিশুর পুষ্টির ব্যাপারে মায়েদের ও পরিবারের অন্যান্যদের কাউন্সেলিং করা স্বাস্থ্যকর্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- সব শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই সেশন সম্পর্কে মতামত জানাতে বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।
- যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে ভিডিওর বিভিন্ন অংশ আবার দেখাবেন।

৫.২ কিশোরীর পুষ্টি

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব ও অপুষ্টি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বাস্তবজীবনে ব্যবহার করতে পারবেন।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫.২. ১ কৈশোরে পুষ্টি

সহায়ক সবাইকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং স্লাইড থেকে কৈশোরকাল, কৈশোরকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং কৈশোরকালীন অপুষ্টির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

কার্যক্রম ১:

কৈশোরকাল

শৈশবকাল থেকে যৌবনে পদার্পণের মধ্যবর্তী সময় (১০-১৯ বছর)-কে কৈশোরকাল বলা হয় এবং এই বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকাল জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এ সময় তাদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাই এ সময় তাদের পুষ্টি চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

কৈশোরকাল: উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক গঠনের পরিবর্তন

উচ্চতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট উচ্চতার ১৫-২০% এই সময়ে হয়
- মেয়েদের চাইতে ছেলেদের দৈহিক বৃদ্ধি দেরীতে শুরু হয়

ওজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট ওজনের ২৫-৫০% এই সময়ে হয়
- দৈহিক গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন
- প্রায় ৪৫% শরীরের কাঠামোর (মাংশপেশী) অংশ বিশেষ এই সময়ে যোগ হয়
- জন্ম থেকে কৈশোরকালের মধ্যে, শরীরের হাড়ের গঠনের ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এই সময় তুলনামূলকভাবে বেশী মাংশ পেশী লাভ করে

কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব

- কৈশোরকালে দেহের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এ সময়ে মোট উচ্চতার ২০% এবং মোট ওজনের ৫০% ওজন বৃদ্ধি হয়। এজন্য এই সময়ে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধিসাধনের সাথে মানবিকবোধ, আবেগানুভূতি ও হরমোনজনিত পরিবর্তনও জড়িত। মেয়েদের দ্রুত শারিরীক বৃদ্ধি সাধন হয় ১০-১৩ বছর বয়সের মধ্যে। ছেলেদের ক্ষেত্রে আরও ২ বছর পরে তা হয় অর্থাৎ ১২-১৫ বছর বয়সের মধ্যে। কৈশোরকালের এই বৃদ্ধি সাধনই পরবর্তীকালের মূল আকার নির্ধারণ করে। প্রাপ্ত বয়স্কদের আকার আকৃতি প্রকৃতপক্ষে দৈহিক পরিমাপকেই প্রতিফলিত করে, যা তার কার্যক্ষমতা, নিরাপত্তা, সন্তান জন্মদানে সহজসাধ্যতাকে নির্ধারণ করে। এছাড়াও মায়ের প্রসবজনিত ঝুঁকির পরিমাণ কমানো ও কম ওজনের শিশুর জন্মদান কমানোর ক্ষেত্রেও মহিলাদের আকার একটি বড় ভূমিকা রাখে।
- কৈশোরে মানুষের জীবনযাত্রা ও খাবারের রুচির পরিবর্তন হয়। অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
- আয়রনের অভাবে কৈশোরকালীন শারীরিক বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়।
- আয়রন ঘাটতির কারণে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক জ্ঞান বৃদ্ধির বিকাশ কমে যায় এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ অনেকাংশে কমে যায়, ফলে স্কুলে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ (বিশেষ করে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন ও বেঁটে হন) মা ও শিশু উভয়েই স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।
- পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ ও খাবার গ্রহণে ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রথাগত আচরণের কারণে শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোরকাল পর্যন্ত মেয়েরা বিশেষভাবে অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকে।

কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধে করণীয়

১. নানান জাতীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার সুষম খাবার খাওয়া:
   - ✓ শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, মুড়ি, চিনি, গুড়, মধু, আলু, চিড়া ইত্যাদি) খাওয়া
   - ✓ আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি) খাওয়া
   - ✓ আয়রন সমৃদ্ধ খাবার (মাংস, কলিজা এবং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি) খাওয়া
   - ✓ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার (কলিজা, পাকা পেঁপে, আম, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, ছোট মাছ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি ও হলুদ রঙের ফল-মূল) খাওয়া
   - ✓ প্রতিদিন ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া
   - ✓ আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার (সামুদ্রিক মাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শাক-সবজি) এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া
২. প্রতিদিন ১০-১২ গ্লাস পানি খাওয়া। গরমকালে বেশি পানির প্রয়োজন হতে পারে
৩. ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়া
৪. প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়া।
৫. খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া
৬. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যাওয়া
৭. মাসিক ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এসময় সবধরনের খাবার খাওয়া যায় এবং সব ধরণের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়
৮. দেরীতে বিয়ে ও দেরীতে গর্ভধারণ করা

৫.২. ২ কিশোরীর পুষ্টিকর খাবার

সহায়ক স্লাইডের মাধ্যমে কিশোরীদের বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অনুপুষ্টি উপাদান, উৎস এবং কাজ ব্যাখ্যা করবেন।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা আলোচনা করবেন।

কার্যক্রম ২:

কিশোরীদের বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অনুপুষ্টি উপাদান, উৎস এবং কাজ

কিশোরী বয়স বেড়ে ওঠার বয়স। ১৮ বছর পর্যন্ত তাদের দেহের এই বৃদ্ধি চলতে থাকে। একজন পুর্নাঙ্গ নারী হিসেবে বেড়ে উঠতে তার মাংসপেশী, হাড়সহ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেন সঠিক বৃদ্ধি হয় সেজন্য তাকে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার বেশি পরিমাণে খেতে হবে।

আমিষঃ কিশোরী দেহের কাঠামোগত বৃদ্ধির জন্য আমিষজাতীয় খাবার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় উৎস থেকেই আমিষ পাওয়া যায়। প্রাণীজ আমিষ পাওয়া যায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ছানা, পনির, শুটকি মাছ ইত্যাদি থেকে। বিভিন্ন ধরণের ডাল যেমন: মুগ, মুসুর, মাসকলাই, ছোলা, সীমের বিচি, মটরশুটি, চীনাবাদাম, সয়াবীন ইত্যাদি থেকে আমরা উদ্ভিজ আমিষ পেয়ে থাকি। দেহের সঠিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য এ জাতীয় খাবার নিয়মিত খেতে হবে। চাল ও ডালের আমিষ একত্রিত হয়ে উন্নতমানের আমিষ হয়। তাই চাল ও ডাল একত্রে খাওয়া শরীরের জন্যে ভালো।

লৌহ (আয়রন)ঃ বাংলাদেশের কিশোরীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই রক্তস্বল্পতার এবং রক্তে আয়রন স্বল্পতার শিকার। আয়রনের অভাবে কৈশোরকালীন বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিকের কারণে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে সুস্থ মা হিসেবে নিজেকে তৈরী করার জন্য কিশোরীদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন জমা থাকা প্রয়োজন। প্রানিজ খাবার যেমন- মাছ/ ছোট মাছ/ মাংস/ কলিজা/ ডিম ইত্যাদিতে লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে। কচুশাক, লালশাক, ধনেপাতা, পাটশাক, হেলেঞ্চাশাক, কলার মোচা, দেশি গাব, বিলেতী গাব, কালোজাম, কলা, পেয়ারা, ডালিম ইত্যাদিও লৌহের উৎস। এছাড়া শুটকি মাছেও প্রচুর আয়রন আছে।

ক্যালসিয়ামঃ হাড়ের বৃদ্ধি ও দাঁতকে সুগঠিত করতে ক্যালসিয়াম জরুরী। ডিম, দুধ, দই, পনির, শুটকি মাছ, মাথা ও কাঁটাসহ ছোট মাছ থেকে প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। পাঁচ ফুটের কম উচ্চতার মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় জটিলতা বেশি হয়। অনেক সময় মা ও শিশুর মৃত্যুও ঘটে। পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের অভাবে পরবর্তী জীবনে অষ্টিওপরেসিস বা হাড়ের ক্ষয় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এজন্যে মেয়েদের উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা হওয়া প্রয়োজন। তাই ক্যালসিয়াম আছে এমন খাবার কিশোরীদের বেশি পরিমাণে খাওয়া দরকার।

আয়োডিনঃ আয়োডিন কিশোরীদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার কিশোরীদের মেধাবী এবং স্বাস্থ্যবান হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তাদের বুদ্ধি বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ ও আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে।

ভিটামিন সিঃ কিশোরীদের প্রতিদিন ভিটামিন সি গ্রহণ করতে হবে। আয়রনযুক্ত খাবারের সাথে ভিটামিন-'সি' যুক্ত খাবার গ্রহণ করলে আয়রন শোষণ বৃদ্ধি পায়। এ চাহিদা পূরণের জন্যে তারা লাল ও সবুজ শাক-সবজি, লেবু, কমলা, পেয়ারা, আমলকি, জাম্বুরা, আনারস, বরই, কামরাঙ্গা, টমেটো, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি খেতে পারে।

এছাড়া পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কিশোরীদের প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করা এবং সেই সাথে নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খেলাধুলা করা প্রয়োজন।

কার্যক্রম ৩:

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে চারটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলকে কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন।

এরপর সহায়ক খাবারের তালিকা দেখাবেন এবং মিলিয়ে নিতে বলবেন।

কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা

প্রতিদিন কিশোর-কিশোরীদের নানান জাতীয় পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। একজন কিশোর/কিশোরী কি কি খাবার খেলে তার দৈনিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হল:

কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমূনা খাদ্য তালিকা (২৫০ মি: লি: বাটির হিসাব)

সকালের খাবার	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
- মাঝারী সাইজের ২টি রুটি অথবা ১ বাটি ভাত - ১ বাটি সবজি অথবা ১টি ডিম	- যেকোন দেশ মৌসুমী ফল - বাড়ীতে তৈরী নাস্তা জাতীয় খাবার	- ২/৩ বাটি ভাত - ১ বাটি শাক্-সবজি - ১ বাটি ঘন ডাল - ১ টুকরা মাছ/ মাংস/কলিজা	- দুধ দিয়ে তৈরী ঘন যেকোন খাবার (পায়েস ও দই ইত্যাদি)/যেকোন দেশী মৌসুমী ফল/বাড়ীতে তৈরী নাস্তা জাতীয় যেকোন খাবার	- ২/৩ বাটি ভাত - ১ বাটি শাক্-সবজি - ১ বাটি ঘন ডাল - (যদি সম্ভব হয় ১ টুকরা মাছ/মাংস)

***এছাড়াও কিশোরীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আয়রনসমৃদ্ধ খাবার থাকা বাঞ্চনীয়।**

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- রক্তস্বল্পতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আয়রন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৈশোরকালীন সময়ে রক্তস্বল্পতার কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আয়রন ফলিক এসিড সেবনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কৃমির সাথে রক্তস্বল্পতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.২. ২ রক্তস্বল্পতা

রক্তস্বল্পতা কি?

রক্তে লোহিত কনিকা অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে তাকে রক্তস্বল্পতা বলে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে কিশোরী বয়সে রক্তস্বল্পতার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

সুস্থ মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা

রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা

কিশোরীর রক্তস্বল্পতার প্রধান কারণ:

- খাবারে পর্যাপ্ত আয়রনের অভাব
- বাড়ন্ত শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ না হওয়া
- ঋতুস্রাবজনিত রক্তক্ষরণ
- কৃমি সংক্রমন
- অসময়ে গর্ভধারণ

রক্তস্বল্পতার লক্ষণ:

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলে বুঝা যাবে কিশোরীর রক্তস্বল্পতা আছে:

- ক্লান্তিভাব
- দুর্বলতা
- ক্ষুধামন্দা
- মলিন ত্বক
- মাথা ঘুরানো
- দ্রুত হৃদস্পন্দন
- সহজে রেগে যাওয়া, ইত্যাদি

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১. আয়রনসমৃদ্ধ সুষম খাবার গ্রহণ

- প্রতিদিন আয়রন সমৃদ্ধ সুষম খাবার খেতে হবে। **দুই ধরণের খাবার উৎস থেকে আয়রন পাওয়া যায়- প্রাণীজ উৎস এবং উদ্ভিজ্জ উৎস**। তবে প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়রনের ৩০% শরীর শোষণ করতে পারে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে মাত্র ২-১০% আয়রন শরীরে শোষণ হয়। এতে বোঝা যায় প্রাণীজ উৎস শরীরের আয়রন ঘাটতি পূরণে বেশী সহায়ক। তাই প্রতিদিনের খাবারে অন্তত একবেলা প্রাণীজ খাবার খাওয়া উচিত।
- চা ও কফি খেলে তা শরীরে আয়রন শোষণ ব্যাহত করে, তাই দুপুর এবং রাতের প্রধান খাবারের সাথে চা ও কফি খাওয়া যাবে না
- শরীরে আয়রন কাজে লাগানোর জন্য আয়রন জাতীয় খাবারের সাথে ভিটামিন সি যুক্ত (যেমন-লেবু বা টক ফল) খাবার খেতে হবে। **ভিটামিন 'সি' এর ভালো উৎস হচ্ছে মৌসুমী ফল, যেমন: লেবু, পেয়ারা, আমড়া, আমলকী, কামরাঙ্গা, বড়ই ইত্যাদি। শাকসবজির ক্ষেত্রে ভিটামিন 'সি' এর ভালো উৎস হচ্ছে টমেটো, কাঁচামরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক ইত্যাদি।**

৫. ৩: গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি

সময়: ৩০ মিনিট

- এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি সম্পর্কে জানবেন।
- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ২টি দলে ভাগ করে নিবেন, ১ম দলের কাছ থেকে জেনে নিবেন গর্ভবতী মাকে কোন কোন ধরণের বা কি কি খাবার, কতটুকু পরিমাণ, দিনে কতবার খেতে দিতে হবে এবং কেন? অংশগ্রহণকারীদের মতামত পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- ২য় দলের কাছ থেকে জেনে নিবেন প্রসূতি মাকে কোন কোন ধরণের বা কি কি খাবার, কতটুকু পরিমাণ, দিনে কতবার খেতে দিতে হবে এবং কেন? অংশগ্রহণকারীদের মতামত পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সহায়ক বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং কোন গুরুতপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে গেলে বা কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকলে তা নিয়েও আলোচনা করবেন।

৫.৩. ১ গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি

যেহেতু মায়ের শরীর থেকে শিশু খাবার গ্রহণ করে এবং পুষ্টি পায়, সেহেতু গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে। মাকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। মায়ের পুষ্টির উপরেই নির্ভর করে গর্ভের শিশুর পুষ্টি ও তার শারীরিক গঠন ও মানসিক বা বুদ্ধির বিকাশ। সবধরণের পুষ্টিকর খাবার একটু বেশী করে খেলে গর্ভের শিশুর পুষ্টির প্রয়োজনও পূরণ হবে এবং পুষ্টি মায়ের শরীরে চর্বি হিসাবে জমা থাকবে, যা পরবর্তীতে বুকের দুধ তৈরিতে সাহায্য করবে। এছাড়া প্রসবের সময় মায়ের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের শরীরে পুষ্টির সঞ্চয় থাকলে প্রসবের সময় মা দুর্বল হয়ে পড়বে না এবং মা ও শিশু সুস্থ থাকবে।

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওজন স্বাভাবিকভাবে ৯ থেকে ১২ কেজি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এরমধ্যে শিশুর ওজন ২.৫-৩ কেজি, বাকিটা মায়ের গর্ভফুল, জরায়ু, রক্ত, মাংসপেশি, চর্বি, স্তন, জরায়ুর ভিতর পানি (এ্যামনিওটিক ফ্লুইড), ইত্যাদি। এই ওজন বৃদ্ধি নির্ভর করে মায়ের খাদ্য গ্রহণের উপর এবং শারীরিক সুস্থতার উপর। এজন্য এসময় মায়ের খাদ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তাই প্রতিদিন মা যে পরিমাণ খাবার খেত তার সাথে কমপক্ষে আরও ৫০০ কিলোক্যালরি সমপরিমাণ বাড়তি খাবার গ্রহণ করতে হবে।

স্বাভাবিক একজন প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর বয়সের উপরে) মহিলার জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন ২,০০০ কিলোক্যালরি, গর্ভবতী মহিলার জন্য প্রয়োজন আরও ৫০০ কিলোক্যালরি, তাহলে একজন গর্ভবতী মহিলার প্রতিদিন প্রয়োজন (২,০০০+৫০০) ২৫০০ কিলোক্যালরি শক্তির। এই বাড়তি ৫০০ কিলোক্যালরির মধ্যে শিশুর জন্য প্রয়োজন ৩০০ কিলোক্যালরি এবং বাকি ২০০ কিলোক্যালরি মায়ের শরীরে চর্বি আকারে সঞ্চয় হয়, যা পরে মায়ের প্রসবের সময় শক্তি হিসাবে ও পরে শিশুর জন্য বুকের দুধ তৈরীতে সহায়তা করে।

এছাড়াও মায়ের যদি যমজ বাচ্চা হয় তবে তাকে আরও ৩০০ কিলোক্যালরি অর্থাৎ মোট বাড়তি (৫০০+৩০০) ৮০০ কিলোক্যালরি বেশী খাবার গ্রহণ করতে হবে।

তবে খেয়াল করতে হবে, মায়ের বয়স যদি ১০-১৯ বছর হয়, অর্থাৎ সে যদি কিশোরী হয় তবে তাকে আরও বেশি পরিমাণে খেতে হবে। কারণ এ বয়সে কিশোরী মেয়েদের শারীরিক গঠন (হাড়, মাংসপেশী বৃদ্ধি) চলতে থাকে, পাশাপাশি তার গর্ভের শিশুরও বৃদ্ধি হয়, ফলে তার খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কিশোরীদের স্বাভাবিক চাহিদা প্রতিদিন ২,২০০ কিলোক্যালরি, গর্ভবতী কিশোরীর জন্য প্রয়োজন আরও বাড়তি ৫০০ কিলোক্যালরি, অর্থাৎ মোট (২,২০০+৫০০) ২,৭০০ কিলোক্যালরি। কিশোরী যদি যমজ সন্তান গর্ভধারণ করেন তাহলে তার মোট প্রয়োজন হবে (২,২০০+৫০০+৩০০) ৩,০০০ কিলোক্যালরি।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়ের প্রতিদিনের পুষ্টি/ক্যালরির চাহিদা দেখানো হলো:

কিশোরী গর্ভবতী মা	স্বাভাবিক চাহিদা	বাড়তি চাহিদা	যমজ শিশুর মা	সর্বমোট চাহিদা
প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের বেশী)	২,০০০	৫০০	-	২,৫০০
প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের বেশী)	২,০০০	৫০০	৩০০	২,৮০০
কিশোরী (১৩-১৮ বছর বয়স)	২,২০০	৫০০	-	২,৭০০
কিশোরী (১৩-১৮ বছর বয়স)	২,২০০	৫০০	৩০০	৩,০০০

গর্ভবতী মায়ের খাবারের পরিমাণ (ছক: ১, ২)

- গর্ভবতী মাকে প্রতিবেলা (কমপক্ষে ৩ বেলা) পারিবারিক খাবার কিছুটা বেশী পরিমাণে খেতে হবে। পাশাপাশি দুইবার নাস্তা খেতে হবে। প্রতিবেলায় বাড়তি খাবার হিসাবে এক মুঠো ভাত, সমপরিমাণ তরকারি, ডাল, ইত্যাদি, দিনে ৩ কাপ দুধ বা দুধের তৈরি খাবার এবং দিনে ২ বার যেকোন মৌসুমি ফল খেতে হবে।
- প্রতিদিন কম পক্ষে ৮ গ্লাস পানি খেতে হবে, এতে করে মা নিজে সুস্থ-সবল থাকবেন এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক ওজনের শিশু জন্ম দিতে পারবেন এবং পরবর্তীতে ভালোভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন।

গর্ভবতী/প্রসূতির একদিনের খাদ্য তালিকা

বেলা	উপাদান	পরিমাণ
সকালের নাস্তা	ভাত অথবা আটার রুটি	১ ১/২ বাটি ৩টি (মাঝারি)
	সবজি ভাজি	১ বাটি
	ডিম ভাজি/সিদ্ধ অথবা ঘন ডাল	১টি ১ বাটি
নাস্তা (সকাল ১০-১১ টা)	মৌসুমী ফল (কলা/আম/কাঁঠাল/পেয়ারা/পেঁপে ইত্যাদি) অথবা দুধের তৈরি পায়েস/ফিরনি/পিঠা	১টি (মাঝারি) ১ বাটি
দুপুরের খাবার	ভাত	৩ বাটি
	ঘন ডাল	১ বাটি
	শাক-সবজি	১ বাটি
	মাছ/মাংস/ডিম	১ টুকরা (মাঝারি) ৩০ গ্রাম
বিকালের নাস্তা	দুধ অথবা গুড়-মুড়ি/গুড়-খই/গুড়-বাদাম	১ গ্লাস ১/২ বাটি
রাতের খাবার	ভাত	২ বাটি
	ঘন ডাল	১ বাটি
	শাক-সবজি	১ ১/২ বাটি
	মাছ/মাংস/ডিম	১ টুকরা (মাঝারি) ৩০ গ্রাম
	দুধ অথবা দই	১ গ্লাস ১/২ বাটি
১ বাটি = ২৫০ মি:লি: বা ১ পোয়া ১ গ্লাস = ২৫০ মি:লি ১ কাপ = ১২৫ মি:লি রান্নায় তেল ব্যবহার করুন। সম্ভব হলে খাবার পূর্বে খাবারের সাথে ১ চা চামচ তেল যোগ করুন।		

গর্ভবতী মায়ের খাবারের ধরণ

আলোচনা করে জানাতে হবে গর্ভবতী মা কোন কোন ধরণের খাবার খাবেন এবং কেন খাবেনঃ

১. **শর্করা ও চর্বিঃ** শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার থেকেই মা প্রধানত শক্তি পেয়ে থাকে, তাই দিনে ৩ বার ভাত খাওয়ার সময় একটু বেশি পরিমাণে (একমুঠো) খেতে হবে। পাশাপাশি বাড়তি ১ চা চামচ তেল পাতে বা শাক/সবজির সাথে বা ভর্তার সাথে মিশিয়ে খেতে হবে।

এছাড়া নাস্তা হিসাবে আলু ভাজা, ডালের বড়া, তেলে ভাজা চালের পিঠা, গুড়ের তৈরি বিভিন্ন ধরণের পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি শক্তিদায়ক খাবার খেতে হবে। এই বাড়তি শক্তিদায়ক খাবার মায়ের ও শিশুর শরীরের প্রয়োজন মিটিয়ে মায়ের শরীরে বাড়তি মেদ হিসাবে জমা থাকবে, যা প্রসবের সময় মায়ের শরীরে শক্তি যোগাবে, এছাড়াও পরবর্তীতে শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধ তৈরি হতে সাহায্য করবে।

২. **আমিষঃ** গর্ভস্থ শিশুর দেহের মাংসপেশি গঠন, রক্ত তৈরি ও মস্তিষ্কের গঠনের জন্য এবং মায়ের শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য আমিষ প্রয়োজন। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের শরীরে আমিষের চাহিদা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে শেষের ৬ মাসে, কারণ এই সময় শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি বেশী হয়। প্রয়োজনীয় আমিষের অভাবে কম ওজনের ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু জন্ম নেয়। কম ওজন শিশুর পরবর্তীতে মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এছাড়াও আমিষ দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করে। আমিষ মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ তৈরী করে। আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন ৩ বেলার খাবারের মধ্যে যেকোন দুই বেলায় অবশ্যই একটুকরা মাঝারী আকারের (৩০ গ্রাম ওজনের) মাছ/মাংস/ডিম /কলিজা ও দুধ (১ গ্লাস) থাকতে হবে। প্রাণীজ আমিষের পাশাপাশি ঘন ডাল (আধ কাপ), সিমের বিচি, বাদাম (এক মুঠো) ইত্যাদি খেতে পারলে আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

৩. **শাকসবজি ও ফলঃ** ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন ধরণের রঙিন শাকসবজি ও ফল-মূল। মায়ের ও শিশুর সবধরণের ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণের জন্য মাকে প্রতিদিন অবশ্যই সঠিক পরিমাণে শাকসবজি ও ফল-মূল খেতে হবে। দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থাৎ; ত্বক, নখ, চোখ, চুল, দাঁত, মাড়ি, হাড়ের সুস্থতার জন্য ভিটামিন ও খনিজ লবণ প্রয়োজন। হাড়ের গঠন, রক্ত তৈরি, রক্ত জমাট বাঁধা, হজম শক্তি, হজমের পর পুষ্টি উপাদানকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া, সুরুচি ইত্যাদি ঠিক রাখতে ভিটামিন ও খনিজ লবণ একসাথে কাজ করে। এ উপাদানগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেহকে সুস্থ রাখে। ভিটামিনের মধ্যে 'এ', বিভিন্ন ধরণের 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই' ও 'কে' এবং খনিজ লবণের মধ্যে আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি ও ফলে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে, এই কারণে বিভিন্ন প্রকারের গাঢ় সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল ইত্যাদি সবজি ও ফল খেতে হবে। ভিটামিন সবজি ও ফলের রসে, খোসায় এবং কিছু ভিটামিন তেলের মধ্যে থাকে। ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন ৩ বেলা ১ বাটি করে (২৫০ মি:লি) শাক-সবজি খেতে হবে, পাশাপাশি ২ বার যেকোন ধরণের মৌসুমি ফল খেতে হবে।

৪. **দুধঃ** গর্ভকালীন সময় মায়ের ও শিশুর দেহের গঠনের জন্য দুধ খুবই প্রয়োজন। দুধে প্রাণীজ আমিষ, শর্করা ও চর্বি আছে যা মা ও শিশুর দেহের মাংসপেশি গঠনে এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। এছাড়া দুধে খনিজ উপাদান (ক্যালসিয়াম) প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা শিশুর দেহের হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে। অন্যান্য খনিজ লবণের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। দুধে সবধরণের ভিটামিনও আছে।

মা যদি কিশোরী হন তবে দুধের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। প্রতিবেলা এক কাপ করে মোট ৩ গ্লাস দুধ অথবা দুধের তৈরী যেকোন খাবার, যেমন দই, পায়েস, দুধে ভিজানো পিঠা ইত্যাদি খেতে হবে।

৫. **পানিঃ** দেহের সুস্থতার জন্য পানির ভূমিকা অপরিহার্য। আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী মাকে দিনে কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করতে হবে। বর্তমানে টিউবওয়েলের বা সাপ্লাই এর পানি যেটাই হোক না কেন অবশ্যই ২০ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হবে। এতে করে পানিবাহিত রোগ, যেমন ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি হওয়ার

সম্ভাবনা কমে যাবে। দেহে পানির পরিমাণ কম হলে শিশুর ও মায়ের উভয়ের নানান রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। মায়ের শরীরে পানির পরিমাণ কম হলে তলপেটে ব্যথা করে, অপরিণত শিশু অথবা কম ওজনের শিশুর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. **আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট:** মাকে গর্ভের চার মাস থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১টা করে আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট (৬০ মি.গ্রা আয়রন এবং ৪০ মি.গ্রা. ফলিক এসিড) খেতে হবে, এতে করে মায়ের এবং গর্ভের শিশুর রক্তস্বল্পতা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে ও গর্ভের শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ঠিকভাবে হবে। মায়ের রক্তস্বল্পতা থাকলে প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বেশী হয়। আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট নিয়মিত খেলে রক্তস্বল্পতা কমে যাবে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণও হবে না।

মা যদি ভাত খাওয়ার সময় প্রতিদিন একটা করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খান এবং পাতে একটু লেবু খান তবে ট্যাবলেটটি শরীরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না এবং খুব ভালোভাবে কাজ করবে।

৭. **রিবোফ্লাভিন বা বি-২:** গর্ভবতী মায়ের ঠোঁটের কোনায় ঘা দেখা দিলে তাকে প্রতিবেলা ১টা করে রিবোফ্লাভিন ট্যাবলেট (রিবোসন) দিনে ৩ বার খেতে দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত ঘা ভাল না হয়।

৮. **ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট:** মায়ের শরীরের ঘাটতি পূরণ ও শিশুর হাড় ও দাঁতের সঠিক বৃদ্ধির জন্য গর্ভের চার মাস থেকে মাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১টা করে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট (৫০০ মিলিগ্রাম) খেতে হবে। ভরা পেটে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেলে শরীরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। মায়ের দাঁতের ও হাড়ের সমস্যাও দেখা দেবে না।

৯. **কৃমিনাশক ট্যাবলেট:** গর্ভাবস্থায় মায়ের পেটে যদি কৃমি থাকে তবে মা যতই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুক না কেন দেহের পুষ্টিগত অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। তাই মাকে গর্ভের ৫-৭ মাসের মধ্যে ১টি কৃমিনাশক বড়ি (এলবেনডাজল) গ্রহণ করতে হবে।

১০. **আয়োডিনযুক্ত লবণ:** রান্নায় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে, এতে গর্ভের শিশুর মানসিক বিকাশ বা বুদ্ধির বিকাশ ভাল হবে।

১১. মাকে অবশ্যই জর্দা, তামাক পাতা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫.৩. ২ প্রসূতি মায়ের পুষ্টি:

আলোচনা করে জানাতে হবে প্রসুতি মা কোন কোন ধরণের খাবার খাবেন এবং কেন খাবেন:

১. প্রসূতি মাকেও গর্ভবতী মায়ের মতো কিছুটা বেশী পরিমাণে খাবার গ্রহণ করতে হবে, এতে করে মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং শিশু প্রচুর পরিমাণে বুকের দুধ পাবে। প্রসূতি মায়ের দৈনিক বাড়তি ৭০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ৫০০ কিলোক্যালরি খাবার থেকে আসবে এবং বাকি ২০০ কিলোক্যালরি মায়ের শরীরে গর্ভাবস্থায় সঞ্চিত মেদ বা চর্বি থেকে আসবে। সুতরাং গর্ভকালীন সময় মা যেভাবে বাড়তি খাবার খেতেন ঠিক সেভাবে খাওয়া চালিয়ে যাবেন যতদিন পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন।

২. প্রসবের পর কমপক্ষে তিনমাস পর্যন্ত আয়রন-ফলিক এসিড ট্যাবলেট প্রতিদিন ১টা করে এবং ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ১টা খেতে হবে, ফলে মায়ের রক্তস্বল্পতা হবে না এবং শিশুরও মায়ের দুধের মাধ্যমে আয়রনের চাহিদা পূরণ হবে। পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট মায়ের ও শিশুর হাড় ও দাঁতের গঠন করবে।

৩. প্রসূতি মায়ের ঠোঁটের কোনায় ঘা দেখা দিলে তাকে প্রতিবেলা ১টা করে দিনে ৩ বার রিবোফ্লাভিন বা বি-২ ট্যাবলেট (রিবোসন) খেতে দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত ঘা ভাল না হয়।

৪. শিশুর জন্মের পর মাকে ১৪ দিনের মধ্যে একটি ২০০,০০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে। এতে মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে এবং মায়ের দুধের মাধ্যমে শিশুর চাহিদাও পূরণ হবে, ফলে শিশুর রাতকানা, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা কমে যাবে।

৫. প্রসূতি মা প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করতে হবে। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।

৬. মাকে অবশ্যই জর্দা, তামাক পাতা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

নোটঃ অনেকেই মনে করেন যে, মাকে বেশী পরিমাণ বা পুষ্টিকর খাবার দিলেই তার বুকে বেশী পরিমাণে দুধ আসবে। এটা ঠিক নয়। বেশী খাবার মায়ের জন্য ভালো। কিন্তু বুকের দুধ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন শিশুকে বুক খালি করে বেশী সময় নিয়ে বারবার দুধ খাওয়ানো।

অধিবেশন ৬:

কাউন্সেলিং:

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- সঠিক কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের জন্য যে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা বুঝতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা জানবেন।
- কাউন্সেলিং করতে শিখবেন।

কার্যক্রম ১: কাউন্সেলিং কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা

কার্যক্রম ২: অভিনয়ের (রোল প্লে) মাধ্যমে কাউন্সেলিং অনুশীলন

মোট সময়: ২ ঘণ্টা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: পুতুল

কার্যক্রম ১: কাউন্সেলিং কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা

- রোলপ্লে করার সময় সহায়ক ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাবে কাউন্সেলিং করে দেখাবেন।
- সহায়ক কি কি ভুল করেছেন তা অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে কাউন্সেলিং দক্ষতা বাড়াবার জন্য মতামত জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানার পর তিনি পুনরায় সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করে দেখাবেন।

কাউন্সেলিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা (গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা)/পরিচর্যাকারীর সমস্যাগুলো কি সেগুলো মনোযোগের সাথে শোনা, তাকে সহানুভূতি দেখানো এবং তারপর যুক্তি, তথ্য ও পরামর্শের দ্বারা সমস্যাসমূহ নিরসনের উপায় খুঁজে বের করে সেবাগ্রহীতাকে বিষয়টি বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব:

আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সাহায্য করে

সমস্যার সমাধান করে

কোন ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করে

অভ্যাস/ আচরণ পরিবর্তনে বা নতুন কোন অভ্যাস/ আচরণ গ্রহণে সহায়তা করে

সফলভাবে কাউন্সেলিং করার জন্য নিচের ধাপগুলো মেনে চলতে হবে:

আলোচনার পরিবেশ তৈরী করা

সেবাগ্রহীতার কথা শোনা

আলোচনার মধ্য থেকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা

সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা

সেবাগ্রহীতা কি বুঝেছেন তা যাচাই করে দেখা

আত্মবিশ্বাস/আস্থা তৈরী করা

কাউন্সেলিং এর দক্ষতাসমূহ: যোগাযোগের ধরণ এবং এ সময় যা লক্ষ্য রাখতে হবে

যোগাযোগের ধরণ ২ প্রকার:

১. কথা না বলে যোগাযোগ করা (Non- verbal communication)

২. কথা বলে যোগাযোগ করা (Verbal communication)

১. কথা না বলে যোগাযোগ করা (Non- verbal communication):

কথা না বলে যোগাযোগের সময় স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

একই অবস্থানে বসা (Keep your head level)

চোখে চোখ রাখা (Eye contact)

কোন বাধা না রাখা (Remove barrier)

সময় নেয়া (Taking time)

সঠিকভাবে স্পর্শ করা (Appropriate touch)

২. কথা বলে যোগাযোগ করা (Verbal communication):

স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে যোগাযোগের সময় তাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

খোলা প্রশ্ন করা (Open Question)

মায়ের কথায় আগ্রহ প্রকাশ করা (Use response & show interest)

মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করা (Reflect back)

মায়ের অনুভূতি বুঝতে পারা (Show that you understand how she feels)

বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা (Avoid using judging words)

খোলা প্রশ্ন করা (Ask open questions):

খোলা প্রশ্ন সাধারণত খুবই উপকারী। প্রশ্নের উত্তরে মা অবশ্যই আপনাকে কিছু তথ্য দিবে। খোলা প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয় 'কিভাবে, কি, কখন, কোথায়, কেন' এই সব শব্দ দিয়ে। যেমন "কিভাবে আপনি শিশুকে খাওয়াচ্ছেন?"

বদ্ধ প্রশ্ন একটু কম উপকারী। মায়ের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, মা তাই উত্তর দেয় এবং উত্তরটি হ্যাঁ বা না হয়। বদ্ধ প্রশ্ন সাধারণত শুরু হয়: "আপনি কি খেয়েছেন?" "আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান?"

সহানুভূতি দেখানো (Using responses and gestures which show interest):

একজন মায়ের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছেন এবং কথা শোনার আগ্রহও আপনার আছে। আপনি যে তার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনছেন এটা বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে তার দিকে তাকান, মাথা নাড়ান এবং হাসি দিন।

উদাহরণ:

মা: আমি উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু খেয়েছিলাম যার জন্য সে আমার বুকের দুধ হজম করতে পারেনি।

স্বাস্থ্যকর্মী: আহা (সহানুভূতি প্রকাশের জন্য মাথা নাড়ুন)

মায়ের কথার পূনরাবৃত্তি করা (Reflect back what the mother says):

মাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে আপনি মায়ের কথা শুনছেন, এ জন্য মা যা বলছে সেই কথা আরো পরিষ্কার করে বোঝার জন্য মাকে একই কথা বলতে হবে, এতে করে মা বুঝবেন আপনি তার কথা শুনছেন।

উদাহরণ:

মা: আমার শিশু বেশি খেতে চায়। সারাক্ষণই প্রায় দুধ মুখে নিয়ে রাখতে চায়, আমি ক্লান্ত বোধ করি।

স্বাস্থ্যকর্মী: শিশুটি খুব বেশি খেতে চায়।

মায়ের অনুভূতি বুঝা (Show that you understand how she feels):

যখন একজন মা তার সন্তানের ব্যাপারে কোন প্রকার অনুভূতি ব্যক্ত করবেন, তখন আপনাকে অবশ্যই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছেন। সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দুইটি ভিন্ন বিষয়। যখন আপনি কারো জন্য দুঃখ পেলেন তার মানে আপনি তাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, কিন্তু বিষয়টিকে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনুভব করতে হবে। একজন মায়ের অনুভূতি বোঝার জন্য সহমর্মিতা অনেক বেশি কার্যকরী। সহমর্মিতা দিয়ে একই সাথে মায়ের ভাল ও খারাপ দুইটি অনুভূতিকেই সহজে অনুধাবণ করা যায়।

উদাহরণ:

মা: শিশু আমার বুকের দুধ খেতে চাচ্ছে না। আমার বুকের দুধ সে এখন পছন্দ করছে না।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি কি মনে করছেন যে সে আপনাকে পছন্দ করছে না?

মা: হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে আমাকে ভালোবাসে না, সে এই সপ্তাহ থেকে এই রকম শুরু করেছে যখন থেকে তার দাদী আমাদের সাথে থাকতে এসেছে এবং তাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছে।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনার কি মনে হচ্ছে তিনিই শুধু শিশুকে খাওয়াতে চাচ্ছেন?

মা: হ্যাঁ, সে আমার শিশুকে আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে চায়।

মন্তব্য: স্বাস্থ্যকর্মী সরাসরি কোন প্রশ্ন করা ব্যতিরেকে সহমর্মিতা দিয়ে মায়ের অনুভূতি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন।

স্বস্তিদায়ক অনুভূতি:

মা: শিশু খুব ভালোভাবে দুধ টেনে খাচ্ছে আর খাওয়ার পর সে খুশিতে থাকে।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি নিশ্চয় খুব খুশি যে আপনার শিশু ভালো আছে।

মা: হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি এবং আমি তাকে বোতলের দুধ খাওয়াবো না।

স্বাস্থ্যকর্মী: আপনি আপনার শিশুকে আনন্দের সাথে দুধ খাওয়াচ্ছেন এটা খুবই ভালো।

মন্তব্য: এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মায়ের সুখানুভূতিতে ও আপনাকে আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে।

বিচারমূলক শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা (Avoid using judging words):

কাউন্সেলিং-এর সময় বিচারমূলক শব্দ পরিহার করলে আসল তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা উচিত। বাংলা ভাষায় কিছু কিছু শব্দ বলা যেতে পারে যেমন-ভালো, মন্দ, ঠিক, ভুল, খারাপ, যথেষ্ট, যথাযথভাবে ইত্যাদি এগুলো বিচারমূলক শব্দ। **উদাহরণ:**

আপনার শিশু কি ঠিকমত দুধ খায়? এখানে 'ঠিকমত' বিচারমূলক শব্দ। এর উত্তরে মা হ্যাঁ বা না বলবেন। আর যদি প্রশ্ন করা যায় আপনার শিশুকে দুধ খাওয়ানো কেমন চলছে? এর উত্তরে মা অনেক কথা বলবেন। তখন কাউন্সেলরের বুঝতে সুবিধা হবে যে সমস্যাটা কোথায়। এজন্য কাউন্সেলিং এ বিচারমূলক শব্দ পরিহার করা উচিত।

মায়ের আত্মবিশ্বাস অর্জনের ধাপসমূহ:

GALIDRAA

G-Greet (গ্রীট) - হাসি মুখে মাকে স্বাগত জানান

A- Ask and Assess (আস্ক এন্ড অ্যাসেস) - বর্তমান অভ্যাসসমূহ নিয়ে আলোচনা করুন

L-Listen (লিসেন) - কি বলে, তা শুনুন

I-Identify (আইডেনটিফাই) - সম্ভাব্য সমস্যাটি সনাক্ত করুন

D-Discuss (ডিসকাস) - কিভাবে এই সব সমস্যা দূর করা যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন

RA-Recommend and Negotiate Actions (রিকমেন্ড এন্ড নেগোশিয়েট একশনস)-

বিকল্পগুলো তুলে ধরুন, অবস্থার উন্নয়নে তারা নতুন নতুন চর্চাগুলো অনুশীলন করতে রাজি আছেন কিনা তা জানতে চান এবং সেবা গ্রহণকারীকে বলুন কোন একটি ব্যবস্থা বাছাই করতে যা তারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন

A-Appoinment (এ্যাপয়েন্টমেন্ট) - ফলো-আপ ভিজিটের জন্য তারিখ ঠিক করুন।

কিভাবে মায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবেঃ

- মায়ের কথা গ্রহণ করা- মা যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। মায়ের কথা বিশ্বাস করা এবং তিনি যা বলেছেন সে ব্যাপারে তার সাথে তর্ক বা উল্টা প্রশ্ন না করা বা মাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে না দেয়া
- মায়ের কাজের প্রশংসা করা এবং শিশুর সম্পর্কে ভালো কথা বলা
- হাতে কলমে সাহায্য করা- প্রয়োজনে মাকে শিশুর খাবার তৈরী করতে বা মা যাতে আরাম করে সময় নিয়ে শিশুকে খাওয়াতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা
- প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া (২/৩ টির বেশী না) - দুই তিনটার বেশী পরামর্শ একদিনে না দেয়া।
- খুব বেশী বললে মা'র পক্ষে কোনটাই করা সম্ভব হবে না। মা'র পক্ষে করা সম্ভব এমন ২-৩ টি পরামর্শ দিতে হবে এবং তার কাছে শুনে নিতে হবে আপনি যা বললেন তা কি কি এবং তার পক্ষে এসব করা সম্ভব কি না
- সহজ ভাষা ব্যবহার করা- সহজ ভাষায় অর্থাৎ যেভাবে আমরা কথা বলি সেভাবে মায়ের সাথে কথা বলতে হবে। কঠিন ভাষা যা মায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় তা ব্যবহার করা যাবে না

কার্যক্রম ২: রোল প্লের মাধ্যমে অনুশীলন

- সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ২টি বড় দলে ভাগ করবেন, যেমন দল ক ও দল খ। প্রতিটি দলকে আবার ২টি উপদলে অর্থাৎ মোট ৪টি ছোট দলে ভাগ করবেন, যেমন দল ক১ ও ক২ এবং দল খ১ ও খ২। ছোট দলের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১জন মা ও ১জন কাউন্সেলর হবেন। বাকি অংশগ্রহণকারীরা পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকবেন এবং মনোযোগ সহকারে কাউন্সেলরের কথা শুনবেন ও দেখবেন যাতে করে পরবর্তীতে কাউন্সেলারকে ফিডব্যাক দিতে পারেন। দলের সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের রোল প্লে কিভাবে করতে হবে তা শিখিয়ে দেবেন এবং একটি কাহিনী বা কেস স্টাডি দেবেন। এভাবে অন্যান্য দলগুলো একে একে রোল প্লে করবেন। সহায়ক নিশ্চিত করবেন যাতে সকল অংশগ্রহণকারীগণ কাউন্সেলরের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান।
- সহায়ক কাউন্সেলিং এর সময় অংশগ্রহণকারীগণের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন এবং কাউন্সেলর হিসেবে অংশগ্রহণকারীর ভালো বিষয় ও ভুল বিষয়গুলো লিখে রাখবেন এবং পরবর্তীতে বুঝিয়ে বলবেন।
- এই দল হিসেবেই মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেবেন এবং একজন একজন করে মাকে কাউন্সেলিং করবেন। এজন্য দল ভাগ করার পর অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সহায়ক এর নাম ফ্লিপচার্টে লিখে রাখবেন, যাতে পরের দিন মাঠে যাওয়ার আগে সময় নষ্ট না হয়।
- কাউন্সেলিং সেশনের পরে আলোচনার জন্য সহায়ক এর জন্য ১ ঘন্টা সময় বরাদ্দ রাখবেন। প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের কাজ সম্পর্কে মতামত নেবেন, কাউন্সেলর হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা শুনবেন এবং সর্বশেষে সহায়ক নিজের মতামত দেবেন। এভাবে প্রতিটি দলকে ফিডব্যাক দেবেন।
- কি করলে কাউন্সেলিং আরও ভাল করা যাবে সে বিষয়েও সহায়ক আলোচনা করবেন।

অধিবেশন ৭:

অ্যাকুয়াকালচার: ইনক্রিজিং ইনকাম, ডাইভার্সিফাইং ডায়েটস, অ্যান্ড এমপাওয়ারিং ওমেন ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট এর পটভূমি ও কার্যক্রম

প্রকল্পের পটভূমি:

মাছে ভাতে বাঙালি। মাছ বাঙালির অতি প্রিয় খাদ্য। উচ্চ আমিষযুক্ত এই খাবার প্রাণীজ আমিষ চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ যোগান দেয়। মাছের প্রোটিন সহজপাচ্য এবং দেহ গঠনে সহায়ক, বর্তমানে মাছের উৎপাদন লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের চাহিদা ও সরবরাহ মডেল থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে মাছের মাথাপিছু চাহিদা ১৮ কেজি থেকে উন্নীত হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ কেজিতে উন্নীত করতে হবে। ধারণা করা হয় যে, এজন্য ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি করতে পারলেই এ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রতিবছর মাছের উৎপাদন ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বাড়াতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন লক্ষিত মাত্রায় উন্নীত হবে, যা ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী দেখা গেছে যে, মাছচাষের উৎপাদনশীলতা খাদ্যের মান ও সাশ্রয়ী মূল্যের উপর উন্নয়ন নির্ভর করে (Tran and Chan 2018)। এক্ষেত্রে মৎস্যচাষ উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন মডেল এর উন্নয়ন, উন্নতমানের চাষপদ্ধতি, মাছের খাবারের গুণগতমান এবং সাশ্রয়ী দামে খাবার সরবরাহ বেশি মাছ উৎপাদন ও স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করবে। গবেষণা প্রমাণ করে যে, মৎস্য চাষ ২ মিলিয়ন মানুষের দারিদ্র্যতা দূর করে। মাছ চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে এই প্রভাব বিস্তার করার প্রচুর অভিনব সুযোগ প্রদান করে। তারপরেও বাংলাদেশে মৎস্যচাষ ও মৎস্য খাত অনেক উন্নয়ন প্রতিকুলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

মৎস্যচাষ উৎপাদনশীলতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি অব্যাহত রাখতে স্থানীয় সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তিদের অধিক দক্ষতা ও মান বৈষম্য, টেকসই ও ব্যাপক মাৎস্যচাষ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জন, জটিল চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। নারীরা প্রায়শঃই মাছ চাষের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ বা মৎস্য ভ্যালূ চেইনে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপ্রকাশিত বা অগ্রহণযোগ্য থাকে এবং তাদের অনেক কাজই পারিশ্রমিক এর আওতাভূক্ত নয়। এ ধরণের প্রবণতা যখন পরিবর্তন হতে শুরু করে তখন জেন্ডার বাধা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এ সকল সুবিধা নারী-পুরুষ এর মধ্যে বৈষম্যহীনভাবে বিতরণ করতে হবে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪৯ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৮তম (World Economic Forum, 2018) এবং জেন্ডার অসমতাসূচক অনুযায়ী ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৪তম (UNDP, 2018)। লিঙ্গ বৈষম্যহীন কৃষি বা মৎস্য সেক্টরের মূল চ্যালেঞ্জ হলো নারী চাষিদের সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের তুলনায় সীমিত প্রবেশাধিকার। এই গুরুত্বপূর্ণ বাধা নারী চাষিদের পুরোপুরিভাবে মাছ চাষে সম্পৃক্ত হতে এবং বাজার এর সুফল পেতে বাধা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে বসতবাড়ির পুকুরে মাছচাষে নারীদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে অনুৎপাদনশীল ভূমিকার অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ পারিশ্রমিক নেই এবং সিদ্ধান্ত সমূহও নারীদের দ্বারা গৃহীত নয় (FAO 2017)। কেবলমাত্র ফ্যাক্টরীতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ ব্যতিত নারীদের সাপ্তাহিক অ্যাকোয়াকালচার ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়, যা উৎপাদনশীল ভূমিকার অন্তর্ভূক্ত (Choudhury et al 2017)। এ বিষয়ে সেক্টরভিত্তিক কোন পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশে মাত্র ১৭% নারী বিভিন্নভাবে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র বা মাঝারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে খুব কমসংখ্যক নারী (১০%) উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োজিত আছে (Roy 2016)। এই চ্যালেঞ্জটি জেন্ডার ধারণা ও স্টেরিওটাইপের সাথে সম্পৃক্ত যেমন নারীদের মূলকাজ হলো পরিবারের দেখাশোনা করা, যা পরিবারের পুরুষ সদস্যের তুলনায় পারিশ্রমিক বিহীন, মূল্যহীন (কম সম্মানজনক) এবং যা বাড়ির বাইরে নারীর পরিভ্রমণ (mobility) কে সীমিত করে ফেলে (FAO 2017; Aregu et al 2018)।

পুষ্টি চ্যালেঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ অপুষ্টি রোগের প্রধান উৎস্য যা হিউম্যান ক্যাপিটালকে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্যমান খুবই নিম্ন পর্যায়ের হলে অপুষ্টির হার অপ্রত্যাশিতভাবে বেশি হয় (HKI and JPGSPH 2016, Waid etal 2017)। প্রজননক্ষম মহিলা ও শিশুদের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যথা আয়রণ, জিংক, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি১২ এবং ভিটামিন 'এ' এর অপর্যাপ্ত সেবন খর্বকায় এর সাথে সম্পৃক্ত, যা জন্মগতভাবে বুদ্ধিমত্তা বিকাশকে বাঁধাগ্রস্থ করে, উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উপার্জন করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। খর্বকায় এবং অন্যান্য অপুষ্টিজনিত সমস্যা যা দারিদ্র্যতার সাথে সম্পৃক্ত এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা জাতীয় উন্নয়নে একটি নিম্নমূখী ধারা বজায় রাখে। হিসাব করে দেখা গেছে অপুষ্টির কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ বিলিয়ন ডলার উৎপাদনশীলতা কম হয়। মাছ প্রাণীজ আমিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস্য যা অপুষ্টি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৩৪ মিলিয়ন (৩৪০ লক্ষ) জনগোষ্ঠি বিশেষ করে নারী ও শিশুদের দারিদ্র্যতা এবং অপুষ্টি উচ্চ পর্যায়ের যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৪%। কিন্তু এ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মাছ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল যেখানে সামুদ্রিক, মোহনা বা নদীর মাছের পর্যাপ্ততা রয়েছে, সে তুলনায় রাজশাহী বা রংপুর অঞ্চল পুরোপুরিভাবে স্বাদুপানির মাছ, যা ভূগর্ভস্থ পানি বা বৃষ্টির পানির উৎসের উপর নির্ভরশীল। এ অঞ্চল আকস্মিক বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু এখানে সাইক্লোনের ঝুঁকি কম, তবে ক্ষরার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ মাটির বৈশিষ্ট্য ও পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী মাছ উৎপাদনের বিভিন্ন মডেল অনুসরণ করে এখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব, যা ধানের উৎপাদনের সাথেও সমন্বয় করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ অঞ্চলে মাছের পোনা এবং মাছচাষের মানসম্পন্ন অন্যান্য উপকরণ সরবরাহকারী কম এবং এরা বিভিন্ন মার্কেটের সাথে সংযুক্ত। রাজশাহী, ঢাকার বাজারে প্রধান মাছ সরবরাহকারী। কিন্তু স্থানীয় বাজারেও এখান থেকে মাছের যোগান হয়ে থাকে। এছাড়া অনানুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী থেকে ইন্ডিয়াতেও মাছ যায়। ইন্ডিয়ার বাজারে মাছ সরবরাহের এই পদ্ধতিটি একাধারে যেমন সুযোগ সৃষ্টি করে অন্যভাবে চ্যালেঞ্জও বটে। যাই হোক, এ দুই বিভাগে মাছচাষে নারীদের অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে পুষ্টি সংবেদনশীল মাছের উৎপাদন বাড়ানো এবং নারীদের পুষ্টিমান উন্নয়ন এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাবঃ

৫০ মাস মেয়াদি এই প্রকল্পের মাধ্যমে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাছচাষে সম্পৃক্ত (হ্যাচারী, নার্সারি, খাদ্য ডিলার এবং অন্যান্য উপরকরণ বিক্রেতা) উদ্যোক্তাদের সম্পর্ক উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা হবে। যার ফলে টেকসই মৎস্য চাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, মাছ ও সংশ্লিষ্ট উপাদানের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হবে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের (নারী ও পরুষ) আয় বৃদ্ধি পাবে, যা বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়িত করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

- মৎস্য উৎপাদন ও বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পাবে
- বাজারের সাথে সংযোগ এবং লাভজনক ভ্যালু চেইন বৃদ্ধি পাবে
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক নারী ও পুরুষ চাষিদের কাছে গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ ও সেবা নিশ্চিত হবে
- খাদ্য বৈচিত্র্যতা এবং মাছ খাওয়া বৃদ্ধি পাবে
- সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা বাড়বে।

প্রত্যাশিত প্রভাবঃ

- ১০ লক্ষ (১ মিলিয়ন) স্টেকহোল্ডারের বসতবাড়িতে মিশ্রচাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদনশীলতা শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে
- ১০ লক্ষ (১ মিলিয়ন) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি কর্তৃক বাজারজাত মাছ ও মাছজাত উৎপাদের মূল্য বৃদ্ধি পাবে
- সম্প্রসারণ সেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাপ্তি নিশ্চিত ও টেকসই হবে
- মাছ ও মাছজাত খাদ্যসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া (consumption) বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০ লক্ষ নারী ও ছোট শিশুদের মধ্যে মাছ এবং মাছজাত খাদ্যসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার হার বৃদ্ধি পাবে।
- মাছ উৎপাদন ও ভ্যালু চেইন হিসেবে নিয়োজিত হবার মাধ্যমে ১০ লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে।

প্রকল্প এলাকার বিবরণঃ
বৃহত্তর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ।

প্রকল্পের পার্টনার:

স্থানীয় ও জাতীয় সরকার, স্থানীয় সেবাদানকারী এবং স্বনির্ভর গ্রুপ, এনজিও (টিএমএমএম, ব্র্যাক) এবং প্রাইভেট সেক্টর সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন বিনিয়োগকারী এ প্রকল্পের পার্টনার। স্মলহোল্ডার চাষি পরিবার আইডিয়া প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্মলহোল্ডার মৎস্য চাষি পরিবারের সাথে কাজ করা। প্রকল্পের সংজ্ঞানুযায়ী 'স্মলহোল্ডার' মৎস্য চাষি পরিবার বলতে বুঝায়, 'যদি কোন পরিবারের সর্বাধিক ২ (দুই) হেক্টর চাষযোগ্য জমি (পুকুরসহ) থেকে থাকে অথবা যদি হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৪ মেট্রিকটন এর কম হয় অথবা যদি নিজস্ব উৎপাদনের কমপক্ষে ৫০% ভাগ মাছ পরিবারের খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়'।

কোন চাষি পরিবার উল্লেখিত তিনটি শর্তের যেকোন একটি পূরণ করলেই তাকে স্মলহোল্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। নিজস্ব মালিকানাধীন ও ইজারাকৃত উভয় প্রকার জমি বা জলায়তনই পারিবারিক জমি বলে গণ্য করা হবে।

লক্ষিত চাষির বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। পুকুরে মৎস্য চাষ বা মৎস্য চাষ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে অবশ্যই জড়িত থাকতে হবে। যেমন - ধানক্ষেতে মাছচাষ, নার্সারি পরিচালনাকারী, পোনা মজুদকারী (চাপের পোনা চাষ/পরিচর্যাকারী) ইত্যাদি।

কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী (H&N worker):

মাঠ পর্যায়ে ১ জন চাষির জন্য ১ জন কর্মী নিয়োজিত থাকবে, যা নির্ভর করবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপর। এসব স্বাস্থ্যকর্মীগণ চাষি গ্রুপকে এসবিসিসি এপ্রোচের মাধ্যমে কিভাবে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে এ কার্যক্রমটি কিভাবে স্থায়িত্বতা পাবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যেখানে পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য একজন মুখ্য ভূমিকা পালন করবে যিনি ডিজিটাল অ্যাপ ব্যবহারের বিষয়ে অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এর মাধ্যমে গ্রামপর্যায়ে ডিজিটাল অ্যাপ ব্যবহারের প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত হবে।

WorldFish

About WorldFish

WorldFish is an international, not-for-profit research organization that works to reduce hunger and poverty by improving fisheries and aquaculture. It collaborates with numerous international, regional and national partners to deliver transformational impacts to millions of people who depend on fish for food, nutrition and income in the developing world. Headquartered in Penang, Malaysia and with regional offices across Africa, Asia and the Pacific, WorldFish is a member of CGIAR, the world's largest global partnership on agriculture research and innovation for a food secure future.

For more information, please visit www.worldfishcenter.org